DEPARTMENT OF HISTORY
Honours Course
Semester : II
Paper/Core Course : IV (Unit- 2)
Name of the Teacher : Nilendu Biswas

ভূমিকা ঃ হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে সর্বশেষ কেন্দ্রীয় শক্তির পতন ঘটে । হর্ষবর্ধন যদিও সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর ছিলেন না, তবুও উত্তর ভারতের একটা বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ তাঁর দখলে ছিল । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যে শক্তি শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার পরিণতিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির উত্থাণ ঘটে । কেন্দ্রীভূত শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিকেন্দ্রীভূত শাসনের পত্তনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বাংলার পাল বংশ । পালবংশ ছাড়াও রাজপুত শক্তি হিসাবে গুর্জর প্রতিহাররা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । অষ্টম শতকের প্রাড়ন্তে প্রতিহার রাজবংশের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সূচনা হয় ।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের কনৌজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠায় পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের নিকট ঈর্শার কারণ হয়ে দাড়ায় । গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের কৃষি সমৃদ্ধি ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য এর অন্যতম কারণ ছিল । তাই যেন তেন প্রকারে কনৌজ দখলের বাসনায় সমসাময়িক বাংলার পাল, রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার এবং দাক্ষিনাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজন্যবর্গ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । এরই প্রেক্ষিতে কনৌজকে কেন্দ্র করে তিনটি শক্তির মধ্যে বংশপরম্পরায় দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, যা ইতিহাসে ‘ত্রিশক্তি সংঘর্ষ’ নামে পরিচিত ।

পাল বংশের অবক্ষয় ও পতনের সুযোগ গ্রহণ করে সেনরা একাদশ শতকে বাংলাদেশে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন । সেন সাম্রাজ্যের পতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজয় সেনের নাম করতে হয় । হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাঢ়দেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে নিজ যোগ্যতায় এক সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন । বিক্রমপুর তাম্রপট্ট ও দেওপাড়া লিপি থেকে তাঁর সম্পর্কে জানা যায় । সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রামচরিত’ থেকে জানা যায় অপার-মন্দারে লক্ষ্মীশূর নামে একজন পরাক্রান্ত সামন্ত রাজা ছিলেন । শূরবংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করে বিজয় সেন রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

ভারতে মুসলিম বিজয়ের আগে পর্যন্ত উত্তরভারতের রাজনীতিকে ‘রাজপুতের যুগ’ বলে অভিহিত করা হয় । এই সময় উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজপুত জাতির শাখা শাসন করত । বেশিরভাগ রাজপুত রাজ্যগুলি রাজপুতদের অধিকারে ছিল । আলোচ্য পর্বে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস কেবল রাজনৈতিক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তানয়, শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ইতিহাসেই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । দক্ষিণী রাজন্যবর্গ শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা তাঁদের বিদগ্ধমনের পরিচয় রাখেন । পল্লব ও চালুক্য শিল্প এমন এক বিশেষ রীতি ও ভঙ্গীতে গঠিত হয়, যা ছিল তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মন্ডিত । স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই শিল্পের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল । সূক্ষ্ম শিল্পের কাজে ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পল্লবরা স্বকীয়তা দেখান । ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই শিল্প বিকশিত হত ।

শশাঙ্কের নেতৃত্বে আঞ্চলিক শক্তিরূপে গৌড়ের উত্থাণ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড়ের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে কনৌজের মৌখরী রাজারা গৌড় দখলের চেষ্টা করেন । আবার চালুক্য বংশীয় রাজাদের নিরন্তর আক্রমণ গৌড়ের অস্তিত্বকে দুর্বল করে তুলেছিল । গৌড়ের এই টলায়মান অবস্থায় শশাঙ্ক ক্ষমতা দখল করে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । শশাঙ্কের রাজত্ব সম্পর্কে জানতে হলে আমারদের মূলত নির্ভর করতে হয় বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’ ও ইউয়েন সাঙের ‘বিবরণী ‘সি-ইউ-কি’-র উপর ।

শশাঙ্কের বংশ পরিচয় সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না । রোহিতাশ্বের গিরিগাত্রে ‘শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক’ নামটি খোদিত আছে । এখানে মনে হয় গৌড়রাজ শশাঙ্কের কথাই বলা হয়েছে । একথা সত্য হলে শশাঙ্ক প্রথম জীবনে সামন্ত নরপতি ছিলেন হয়ত । ডঃ বি.সি. সেন মনে করেন, শশাঙ্ক মৌখরীদের অধীন সামন্ত নৃপতি ছিলেন । তবে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলতে চেয়েছেন, ‘শশাঙ্কই প্রথম বাঙালি রাজা যিনি আর্যাবর্তে সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।’ দেখাগেছে শশাঙ্ক সামান্য সামন্ত থেকে নিজ বাহুবলে বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী গড়ে তুলেছিলেন ।

সিংহাসনে বসেই তিনি রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হন । গৌড়ের অধিপতি হিসাবে উত্তর ও পশ্চিম বাংলার উপর হয়ত প্রথম থেকেই তাঁর আধিপত্য ছিল । মেদিনীপুর লেখ থেকে জানা যায়, দন্তভুক্তি বা মেদিনীপুর জেলার দাঁতন ও উৎকল জয় করেন । এই অঞ্চল দুটি

সামন্তদের দ্বারা শাসিত হত । উড়িষ্যার কোঙ্গদ অঞ্চলে রাজত্বকারী শৈলোদ্ভব রাজবংশও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে । তাম্রফলকে একজন গৌড়রাজের উল্লেখ আছে, যিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণকে পরাস্ত করেছিলেন । পন্ডিতগণ মনে করেন, এই গৌররাজ ছিলেন শশাঙ্ক ।

শশাঙ্কের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল এই যে তিনি পশ্চিমে কনৌজ রাজ্যের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন । কনৌজের মৌখরীরা ছিলেন গৌড়ের শত্রু । শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সঙ্গে মৈত্রী গঠন করে থানেশ্বরের রাজা গ্রহবর্মনকে হত্যা ও তাঁর কন্যা রাজ্যশ্রীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যান । রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করে মালবরাজ দেবগুপ্তকে হত্যা করেন । কিন্তু এক আকস্মিক আক্রমণে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন । এই অবস্থায় থানেশ্বরের নতুন রাজা হর্ষবর্ধন প্রতিশোধ গ্রহণে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন । হর্ষবর্ধন তাঁর ভগিনী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করলেও শশাঙ্কের সঙ্গে আদৌ তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না । কারণ বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙ এবিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি । তবে জীবিতকালে হর্ষবর্ধন যে শশাঙ্ককে পরাজিত করতে পারেননি তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মগধ শশাঙ্কের অধীনে ছিল ।

ধর্মীয় দিক থেকে শশাঙ্ক ছিলেন শৈব এবং বৌদ্ধদের প্রতি তাঁর চরম বিদ্বেষ ছিল । ইউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর নানা রকম অত্যাচার চালিয়েছিলেন । যেমন- কুশীনগর বিহার থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়ণ, পাটলিপুত্রে বুদ্ধের চরণচিহ্ন অঙ্কিত প্রস্তরখন্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ, বোধিবৃক্ষ ছেদ, বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের অপচেষ্টা । শশাঙ্কের এই বৌদ্ধ বিদ্বেষের কারণ হিসাবে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে বৌদ্ধরা হর্ষবর্ধনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে শশাঙ্কের বৌদ্ধদের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন । তবে শশাঙ্কের এই বৌদ্ধ নির্যাতনের কাহিনী কিছুটা অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় । কারণ, ইউয়েন সাঙের বিবরণ থেকেই জানা যায়, তিনি তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ স্তুপ দেখেছিলেন এবং গৌড়ের বৌদ্ধমঠে বহু বৌদ্ধ নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতেন।

পরিশেষে বলা যায়, শশাঙ্ক কেবল শক্তিশালী বাংলাই গঠন করেননি, উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে বাংলাকে মর্যাদার আসনেও অধিষ্ঠিত করেছিলেন । শশাঙ্কের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে পাল রাজারা বাংলাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্য গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন । প্রশাসক হিসাবে তিনি স্বতন্ত্র রীতির প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন । এই রীতিকেই ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'গৌড়তন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন । বস্তুত শশাঙ্কের সময়েই বাংলার প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃতি লাভ করে ।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের কৃতিত্ব ঃ বাংলার ইতিহাসে গৌড়-অধিপতি শশাঙ্ক অকস্মাৎ উল্কাপিন্ডের মত উদিত হয়ে কিছু সময়ের জন্য আপন কৃতিত্বের দ্বারা সমকালীন ইতিহাসে আলো ছড়িয়ে দেন । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'শশাঙ্ক তাঁর রাজ্য জয় দ্বারা যে নীতির পত্তন করেন, তা অনুসরণ করে পাল রাজারা এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন ।' আর্যাবর্তে বাঙালি সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা সর্বপ্রথম তাঁর মনেই উদিত হয়েছিল এবং তাঁর চেষ্টায় এই কল্পনা আংশিকভাবে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল।

অতি সামান্য ও এক অজ্ঞাত অবস্থা থেকে শশাঙ্ক নিজ যোগ্যতার জোরে ভারত ইতিহাসের পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ান । তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিক উপাদান বেশি নেই । যা কিছু তথ্য আছে তাও আবার তাঁর বিরোধী পক্ষের লেখনী থেকে । বাণভট্টের মত কোন সহানুভূতিপূর্ণ সভাকবি তাঁর ছিল না । তবুও রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে তাঁর জীবন যে সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই । তাঁর বংশপরিচয় ছিল অজ্ঞাত, অনেকটা মহাভারতের মহাবীর কর্ণের মতই । তবে তিনি প্রমাণ করেছিলেন অতীত যাইহোক আপন বাহুবলে এবং অধ্যাবসায়ে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব ।

প্রাচিন ভারতের ইতিহাসে বাংলা ছিল কাব্যে উপেক্ষিতার মতই । উত্তর ভারতীয় শক্তিসমূহ বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করে আসছিল। বাংলাও যে উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে একথা কেউ ভাবতেই পারেনি । শশাঙ্কই সর্বপ্রথম ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেন । তিনি বাংলাকে এক সর্বভারতীয় শক্তিরূপে অন্তত কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন । গর্বিত কনৌজের মৌখরী বংশকে ধ্বংস করে পূর্ব ভাগে ভাস্করবর্মনকে পদানত করে শশাঙ্ক তাঁর বিজয়রথ ছুটিয়ে দেন । দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে তিনি বাংলার চারদিকে প্রাকৃতিক সীমান্ত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন । কনৌজ-গৌড় সংগ্রামের পত্তন করে তিনি পরবর্তীকালে পাল রাজাদের জন্য পথ নির্দেশ করে যান ।

দুঃসাহসী বীর হিসাবে শশাঙ্কের পরিচয় হলেও তিনি একইসঙ্গে সুশাসকও ছিলেন । তাঁর শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি, তবে তিনি যে একজন প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন তা অনুধাবন করা যায় । রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এই সময় সম্পদময়ী নগরীতে পরিণত হয়ে ছিল । তিনি গৌড়ে শুধুমাত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেননি, তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি গঠনের আয়োজনও করেছিলেন । মেদিনীপুরের দাঁতন বা দন্ডভূক্তি অঞ্চলে শশাঙ্ক দীঘি ('শরশঙ্কের সাগর') জলসেচ ব্যবস্থার জন্য তাঁর প্রচেষ্ঠার সাক্ষ্য দেয় ।

চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙের বিবরণে শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যে ধারণা পাওয়া যায় তা থেকে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতারই পরিচয় পাওয়া যায় । প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণমুদ্রা এই সময়ে চালু হয়েছিল । শশাঙ্কের পরবর্তীকালে বাংলায় আর কোন স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল না । হিউয়েন সাঙ তাঁর বিবরণে বাংলার জনপদগুলির কয়েকটি সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন দিয়েছেন । কজঙ্গল বা উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের জমি কৃষির পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত ছিল কারণ আবহাওয়া ছিল আর্দ্র ও উষ্ণ । পুন্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের

অবস্থা সচ্ছল ছিল এবং হিউয়েন সাঙ সেখানে সর্বত্র পুকুর, উদ্যান, সরাইখানা দেখেছিলেন । সেখানে হিউয়েন সাঙ ২০টি বৌদ্ধবিহার এবং ৩০০০-এর অধিক হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেখেছিলেন ।

শশাঙ্কের আমলে সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল । সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের উপস্থিতি থাকলেও সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন ব্রাহ্মণ শ্রেণি । শশাঙ্কের সব তাম্রশাসনেই দেখা যায় যে পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের ভূমি এবং কোন কোন সময়ে গ্রামদান করা হয়েছে । সমাজে কর্মচারী শ্রেণির গুরুত্ব ছিল । তাম্রশাসনে পঞ্চায়েত বোর্ড জাতীয় যে সংস্থার কথা আছে তাতে ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে মহত্তর, মহামহত্তর, প্রধান, মহাপ্রধান, করনিক, পুস্তপাল প্রভৃতি সরকারি কর্মচারির নাম উল্লেখিত আছে । সমাজে নিম্নশ্রেণির মর্যাদা ছিল না, কারণ চন্ডালদের পৃথক পুষ্করিণী ছিল । অবশ্য চন্ডালদের জমিতে স্থায়ী অধিকার ছিল, কারণ তা নাহলে তাদের পক্ষে পুষ্করিণী খনন করা অসম্ভব হত ।

ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে বাণভট্ট বা হিউয়েন সাঙের মত তাঁর কোন সহানুভূতিশীল জীবনীকার ছিল না । এজন্য তাঁর কীর্তি-কাহিনীর সকল কথা আমরা জানতে পারিনি । শশাঙ্কের ব্যক্তিগত চরিত্র অনেকটা বিরোধী লেখকদের অতিরঞ্জনে কালিমালিপ্ত হয়েছে । তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন বলা হয় । আবার বৌদ্ধ নির্যাতনকারী বলেও তাকে দায়ী করা হয় । এর জন্য অবশ্য শশাঙ্কের ধর্মান্ধ নীতি বা বৌদ্ধবিদ্বেষ দায়ী ছিল না । অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে শশাঙ্ক তাঁর শত্রুদের দমন করেছিলেন । সে যাইহোক একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় শশাঙ্ক বাংলায় যে নতুন ধরণের শাসননীতির প্রবর্তন করেছিলেন তাকে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'গৌড়তন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন ।

✍ **'মাৎস্যন্যায়' ঃ** ৬৫০খ্রিঃ থেকে ৭৫০খ্রিঃ পর্যন্ত রাজনৈতিক অবক্ষয়ে সূত্রে বাংলায় এক অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল । শশাঙ্ক স্বাধীন গৌড় রাজ্যের পত্তন করেছিলেন । গৌড়ের অন্যতম আদর্শ ছিল নিজস্ব রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলা, যাকে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় 'গৌড়তন্ত্র' বলে অভিহিত করেছেন । এই আদর্শের নায়ক ছিলেন শশাঙ্ক নিজে । ৬৩৭খ্রিঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে শশাঙ্ক প্রবর্তিত 'গৌড়তন্ত্র' ধ্বংসপ্রায় হয়েছিল । বৌদ্ধ পন্ডিত তারানাথ তাঁর 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' গ্রন্থে শশাঙ্কের পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিল না । প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করতেন । ফলে লোকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না ।

বাংলার এই রাজনৈতিক অরাজকতা ও নৈরাজ্যকে ধর্মপালের 'খালিমপুর তাম্রশাসন' এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' কাব্যে 'মাৎস্যন্যায়' বলে অভিহিত করা হয়েছে । প্রাচিন অর্থশাস্ত্রে 'মাৎস্যন্যায়' বলতে এমন এক অবস্থা বোঝানো হয়েছে যখন দেশে বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে । বাহুবলই একমাত্র বল বলে বিবেচিত হতে থাকে । পুকুরের বড় মাছ যেমন ছোট মাছ খেয়ে প্রাণ ধারণ করে, দেশে অরাজকতার সময় সেই রকম প্রবল অবাধে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে । এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যই 'মাৎস্যন্যায়' কথাটির প্রয়োগ করা হয়েছে ।

মাৎস্যন্যায়ের যুগে সামন্ত রাজারাই ছিলেন দেশের প্রকৃত নায়ক, যারা নিজ নিজ অঞ্চলে স্ব স্ব প্রধান হয়ে ওঠে । সমগ্র বাংলাদেশে কোন একজন শাসক বা রাজা ছিলেন না । কোন কোন এলাকায় রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাদের সামন্তরাই ছিলেন প্রধান রাজনৈতিক শক্তি । তবে মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতার সময়ে বাংলার অর্থনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সব কিছুতেই অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল কিনা তা দেখা দরকার । কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি সম্ভব নয় । এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির চিত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার অপ্রচলনের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে । তাম্রলিপ্তের পতন থেকেও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির ব্যাপারটা অনুমিত হয় ।

এই অরাজক অবস্থার অবসানকল্পে বাংলার 'প্রকৃতিপুঞ্জ' বাংলার সিংহাসনে গোপালকে নির্বাচন করে বলে খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে । গোপাল পাল ছিলেন বাংলার সামন্ত রাজাদের অন্যতম, তাই তাকে সম্মিলিতভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল । আধুনিক পন্ডিতেরা যদিও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে ৭৫০ খ্রিঃ বাংলার জনসাধারণের পক্ষে সংগঠিত হয়ে গোপালকে নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোমিন চৌধুরী খালিমপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী প্রজাপুঞ্জের দ্বারা গোপালের নির্বাচনের কাহিনীকে কাল্পনিক ও অবিশ্বাস্য বলেছেন । তবে প্রাচিন ভারতের ইতিহাসে এরূপ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কাশ্মীরে জলৌকা, বাংলায় সমাচারদেবের নির্বাচনের কথা জানা যায় ।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, গোপালের প্রজাবর্গ কর্তৃক নির্বাচন ছিল পরোক্ষ । অরাজকতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সমাজের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়ে গোপালকে সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন । পরে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এলে গোপালের রাজপদে এই মনোনয়নকে জনসাধারণ অনুমোদন করেছিল । বস্তুত বাংলার নৈরাজ্যের সময়ে ছোট-বড় সামন্ত নায়কের সংখ্যা বেড়েছিল । এঁরাই ছিলেন সেই সময় দন্ডমুন্ডের কর্তা । এই সামন্ত নায়করাই দেশের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দ্বারা অতিষ্ঠ হয়ে সমবেতভাবে গোপালকে

রাজপদে বসিয়ে ছিলেন । নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাঙালি জাতি সে সময় একতা ও স্বার্থত্যাগের যে পরিচয় দিয়েছিলেন কেবল বাংলাই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল ।

✍ পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ঃ ৬৩৭খ্রিঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে শশাঙ্ক প্রবর্তিত 'গৌড়তন্ত্র' ধ্বংসপ্রায় হয়েছিল । সমগ্রদেশে কোন রাজা ছিল না, প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনভাবে শাসন করতেন ফলে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না । এহেন অরাজক অবস্থায় ৭৫০খ্রিঃ বাংলার গোপাল পাল প্রতিষ্ঠা করেন পালশাসনের । গোপাল পাল কর্তৃক ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে অবসান ঘটে অরাজক 'মাৎস্যন্যায়'-এর যুগ এবং এর পরবর্তী ৪০০ বছরে পাল শাসন নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে আছে । গোপাল পালের ক্ষমতা দখল তথা পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাস জানতে ধর্মপালের 'খালিমপুর তাম্রশাসন', দেবপালের 'মুঙ্গের তাম্রলিপি' ও নালন্দা তাম্রলিপি', নারায়ণ পালের 'ভাগলপুর তাম্রলিপি' ও 'বাদল শিলাস্তম্ভলিপি' এবং সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয় ।

এই অরাজক অবস্থার অবসানকল্পে বাংলার 'প্রকৃতিপুঞ্জ' বাংলার সিংহাসনে গোপালকে নির্বাচন করে বলে খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লেখিত আছে । গোপাল পাল ছিলেন বাংলার সামন্ত রাজাদের অন্যতম, তাই তাকে সম্মিলিতভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল । আধুনিক পন্ডিতেরা যদিও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে ৭৫০ খ্রিঃ বাংলার জনসাধারণের পক্ষে সংগঠিত হয়ে গোপালকে নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ মোমিন চৌধুরী খালিপুর তাম্রশাসন অনুযায়ী প্রজাপুঞ্জের দ্বারা গোপালের নির্বাচনের কাহিনীকে কাল্পনিক ও অবিশ্বাস্য বলেছেন । তবে প্রাচিন ভারতের ইতিহাসে এরূপ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়, কাশ্মীরে জলৌকা, বাংলায় সমাচারদেবের নির্বাচনের কথা জানা যায় ।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, গোপালের প্রজাবর্গ কর্তৃক নির্বাচন ছিল পরোক্ষ । অরাজকতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সমাজের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়ে গোপালকে সিংহাসনে বসিয়ে ছিলেন । পরে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এলে গোপালের রাজপদে এই মনোনয়ণকে জনসাধারণ অনুমোদন করেছিল । বস্তুত বাংলার নৈরাজ্যের সময়ে ছোট-বড় সামন্ত নায়কের সংখ্যা বেড়েছিল । এঁরাই ছিলেন সেই সময় দন্ডমুন্ডের কর্তা । এই সামন্ত নায়করাই দেশের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দ্বারা অতিষ্ঠ হয়ে সমবেতভাবে গোপালকে রাজপদে বসিয়ে ছিলেন । নৈরাজ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাঙালি জাতি সে সময় একতা ও স্বার্থত্যাগের যে পরিচয় দিয়েছিলেন কেবল বাংলাই নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল ।

গোপাল সিংহাসনে আরোহণের পর কিভাবে রাজ্যবিস্তার করেন তা জানা যায়নি । তাঁর পৈতৃক রাজ্য ছিল বরেন্দ্রী, তবে মৃত্যুর আগেই গোপাল সমগ্র বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করেন বলে মনে করা হয় । তারানাথের বিবরণের উপর নির্ভর করে বলা হয় যে মগধেও তাঁর অধিকার স্থাপিত হয় । দেবপালের 'মুঙ্গের লিপি' থেকে জানা যায় তিনি সমুদ্রতীর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন । গোপালের প্রধান কৃতিত্ব ছিল তিনি বাংলাকে স্বৈরাচারী ও অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করেন । দীর্ঘদিনের অরাজকতার পরে বাংলায় তিনিই শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন । পবর্তীকালে ধর্মপাল আর্যাবর্তে যে সাম্রাজ্য গঠনে সমর্থ হয়েছিলেন তার বীজ গোপালই বপন করেছিলেন ।

✍ ধর্মপাল ঃ পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র ধর্মপাল পাল বংশের সিংহাসনে বসেন । প্রাচিন যুগের বাংলায় যে সকল রাজার নাম পাওয়া জায় তাঁদের মধ্যে ধর্মপাল শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন । পাল বংশের সামান্য এক আঞ্চলিক রাজ্যকে তিনি এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন । সিংহাসনে আরোহণের পরেই ধর্মপাল উত্তর ভারতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে ত্রিশক্তি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন ।

সমসাময়িক উত্তর ভারতে অবস্থিত কনৌজ অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলে কনৌজকে কেন্দ্র করে তিনটি শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় । মালব বা রাজপুতানা থেকে প্রতিহার শক্তি পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তার করে কনৌজ অধিকার করার চেষ্টা করে । ধর্মপাল প্রতিহার শক্তিকে দমিয়ে কনৌজকে নিজ অধিকারে রাখেন । এদিকে দক্ষিণ ভারত থেকে রাষ্ট্রকূট শক্তি এসে পাল ও প্রতিহারকে পরাজিত করে কনৌজে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে । এইভাবে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে । উত্তর ভারতে কনৌজের আধিপত্য নিয়ে পূর্বাঞ্চলের পাল এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিহারের পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক হলেও দক্ষিণ থেকে রাষ্ট্রকূট শক্তি তাতে যোগ দিয়ে গোলযোগের সৃষ্টি করে ।

খালিমপুর তাম্রশাসন, মুঙ্গের লিপি প্রভৃতি থেকে জানা যায় রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহার শক্তির সামরিক দুর্বলতার সুযোগে ধর্মপাল উত্তর ভারতের বহু স্থান অধিকার করেন । নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাম্রলিপি থেকে জানা যায় ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রয়ুধকে বিতাড়িত করে চক্রায়ুধকে নিজের হাতের পুতুল হিসাবে বসান । ধর্মপালের সামন্তরাজা হিসাবে চক্রায়ুধ রাজত্ব করতে থাকেন । ধর্মপাল দূরবর্তী অঞ্চলে অধীনস্থ সামন্তদের দ্বারা শাসনের নীতি গ্রহণ করেন । খালিমপুর তাম্রশাসন অনুসারে ধর্মপাল উত্তর ভারতের নানা অঞ্চল জয় করে

কনৌজে যে দরবারের অনুষ্ঠান করেন তাতে বহু রাজা উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি বশ্যতা জানায় । এই রাজ্যগুলি ছিল ভোজ, মৎস, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ইত্যাদি ।

ধর্মপালের রাজত্বের শেষদিকে তাঁকে পুনরায় ত্রিশক্তি দ্বন্দ্বে ভাগ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় । প্রতিহাররাজ মৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট সিন্ধু, বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা গড়ে তুলে চক্রায়ুধকে কনৌজ থেকে বিতাড়িত করেন । এই পরিস্থিতিতে ধর্মপাল প্রতিহার শক্তিকে দমন করতে অগ্রসর হন । কিন্তু যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন, কারণ দাক্ষিণাত্য থেকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দকে কনৌজের দ্বন্দ্বে অগ্রসর হতে হয়েছিল । তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণে প্রতিহাররাজ নাগভট পরাজিত হন । আত্মীয়তার কারণে তৃতীয় গোবিন্দ ধর্মপালকে পরাস্ত না করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান । এই সুযোগে ধর্মপাল কনৌজে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আধিপত্য বজায় রাখেন ।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ধর্মাপলের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, 'ধর্মপালের রাজত্বকে বাঙালি জীবনের সুপ্রভাত' বলা চলে । তাঁর কূটনৈতিক ও সামরিক কৃতিত্ব এই কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে ইতিপূর্বে শশাঙ্ক কনৌজ জয় করলেও তা অধিকারে রাখতে পারেননি । কিন্তু ধর্মপাল কনৌজ জয় করে চক্রায়ুধকে কনৌজে বসিয়ে দেন । তৃতীয় গোবিন্দ প্রতিহাররাজ নাগভটকে পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গেলে ধর্মপাল তাঁর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন । কিন্তু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে নাগভট ও তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজয় ধর্মপালের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের হানি করেছিল ।

পরিশেষে ধর্মপালের রাজত্বকালে শিক্ষা, সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি হয় । ধর্মপাল নিজ নামে বিক্রমশীলা বিহার স্থাপন করেন । তিনি সম্ভবত ওদন্তপুরী বিহার স্থাপন করেছিলেন এবং সোমপুর বিহারের স্থাপনের সঙ্গে আংশিকভাবে জড়িত ছিলেন । এই সকল বিহারে বিদ্যাচর্চা, অধ্যাপনা ও ধর্মচর্চা হত । পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী, বৌদ্ধ পন্ডিত হরিভদ্র ছিলেন ধর্মপালের গুরু । নিজে বৌদ্ধ হলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'তিনি শাস্ত্রানুশাসন মেনে চলতেন এবং প্রতি বর্ণের লোক যাতে স্বধর্ম প্রতিপালন করে, তার ব্যবস্থা করেন ।' বাংলার আর্থিক উন্নতি এই সময় বিশেষভাবে ঘটেছিল এবং কৃষি ও বাণিজ্যে বাংলা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল ।

✍ উত্তর ভারতে পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে ত্রিশক্তি সংঘর্ষ ঃ আদি-মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসে উত্তর ভারতের রাজনীতি ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির অন্যতম কেন্দ্র কনৌজ-এর উপর আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সমসাময়িক তিনটি শক্তির মধ্যে দির্ঘদিনব্যাপী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় । বস্তুত হর্ষবর্ধনের রাজধানী নির্মাণের ঘটনায় কনৌজের গুরুত্ব বিভিন্ন শক্তিগুলির নিকট উন্মুক্ত হয়ে যায় । এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় মৌখরী বংশীয় যশোবর্মনের আমলে । কিন্তু কনৌজের মত একটি অখ্যাত রাজ্য কিভাবে বিভিন্ন শক্তির নিকট দির্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল তা যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার ।

কনৌজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রেক্ষাপট ও কিছু ঘটনা দায়ী ছিল । দেখাগেছে মৌর্য ও গুপ্ত বংশের পতনের পর সমগ্র ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা থেকে রাজন্যবর্গ বিরত হয়ে শুধুমাত্র উত্তর বা দক্ষিণ ভারতে কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা চালায় । হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের কনৌজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠায় পার্শ্ববর্তী রাজন্যবর্গের নিকট ঈর্শার কারণ হয়ে দাড়ায় । গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলের কৃষি সমৃদ্ধি ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য এর অন্যতম কারণ ছিল । তাই যেন তেন প্রকারে কনৌজ দখলের বাসনায় সমসাময়িক বাংলার পাল, রাজপুতনার গুর্জর প্রতিহার এবং দাক্ষিনাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজন্যবর্গ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । এরই প্রেক্ষিতে কনৌজকে কেন্দ্র করে তিনটি শক্তির মধ্যে বংশপরম্পরায় দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, যা ইতিহাসে 'ত্রিশক্তি সংঘর্ষ' নামে পরিচিত ।

ত্রিশক্তি সংঘর্ষের সঠিক সময়কাল এবং ঘটনার পরম্পরা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে । যদিও ধরে নেওয়া হয় অষ্টম শতকে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল । নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই শক্তিগুলির মধ্যে বিবাদের সম্পর্ক তৈরি হয়, যা ক্রমে বৃহৎ সংঘর্ষে পরিণত হয়েছিল । উত্তরের পাল ও প্রতিহারের মধ্যে ক্ষমতা বিস্তারকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হলেও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশ এই দ্বন্দ্বে নাক গলিয়ে ত্রিশক্তি সংঘর্ষে পরিণত করেছিল । দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ উত্তর ভারতের রাজনীতিতে পাল বা প্রতিহারদের আধিপত্য বিস্তারের ঘটনাকে ভাল চোখে দেখেনি বলেই ত্রিশক্তি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল । রাষ্ট্রকূটদের আশংকা ছিল এর দ্বারা দক্ষিন ভারতেও পাল বা প্রতিহারদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন আসতে পারে ।

পালরাজা ধর্মপাল নিজের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হন । আবার একই সময়ে প্রতিহাররাজ বৎস মধ্য ভারতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য অগ্রসর হলে উভয়েই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন । গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলে ধর্মপাল প্রতিহাররাজ বৎসের নিকট পরাজিত হন । এই ঘটনায় প্রতিহারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে শঙ্কিত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব উত্তর ভারত অভিযান করেন । ধ্রুবের নিকট পরাজিত হয়ে প্রতিহাররাজ বৎস রাজপুতনায় পলায়ন করলে দোয়াব অঞ্চল ধ্রুবের দখলে আসে । ধ্রুব এরপর ধর্মপালকেও পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন ।

ভাগ্যের সহায়তায় ধর্মপাল কনৌজের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হলেও তাঁর এই সাফল্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি । কেননা, তাঁর রাজত্বের শেষের দিকে কনৌজ ফের ত্রিশক্তি সংঘর্ষের কেন্দ্রে পরিণত হয় । ধর্মপালের পক্ষে এবারেও ভাগ্য সহায় হয়নি । বৎস-এর পর দ্বিতীয় নাগভট্টের অধীনে প্রতিহাররা আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে । বিপুল উদ্যমে নাগভট্টের নেতৃত্বে প্রতিহাররা কনৌজ দখল করতে তৎপর হয় । সিন্ধু, বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি শক্তির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নাগভট্ট আরও শক্তি সঞ্চয় করেন । এরপর এক আকস্মিক আক্রমণ হেনে কনৌজের সিংহাসন থেকে ধর্মপালের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন । অসহায় ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেও মুঙ্গেরের যুদ্ধে নাগভট্টের নিকট পরাজিত হন।

ত্রিশক্তি সংঘর্ষের ঘটনাপ্রবাহ এমন ভাবেই অগ্রসর হয় যে বারংবার প্রতিহার বংশ জয়লাভ করেও তা ধরে রাখতে পারেনি । নাগভট্ট কনৌজ দখল করলেও খুব শীঘ্রই তাঁকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের প্রতিরোধের সম্মুখীণ হতে হয় । ধর্মপালের পরাজয়ে তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে অভিযান চালিয়ে নাগভট্টকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করেন । ধর্মপাল বিনা প্রতিরোধেই গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করে নেন । উত্তর ভারতের রাজনীতিতে প্রতিহারদের প্রাধান্য স্থাপন করেই গোবিন্দ দাক্ষিনাত্যে ফিরে যান । ফলে কনৌজ ফের ধর্মপালের অধিনে আসে । এইভাবে দেখা যায় বারংবার যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হয়েও ঘটনার প্রেক্ষিতে কনৌজের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্তত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কনৌজকে পালদের অধীনে রাখতে পেরেছিলেন ।

সাম্রাজ্য বিস্তারের সংগ্রামে উত্তর ভারতের উদীয়মান রাজ্য কনৌজ দখলের জন্য পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে দীর্ঘ স্থায়ী সংঘর্ষের ঘটনা ছিল সুদূরপ্রসারী । কেননা, এই সংগ্রামে তিনটি শক্তিরই কমবেশি ক্ষতি হয়েছিল । উভয়ের প্রচুর লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হয়েছিল । যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে । করের বোঝা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল । যুদ্ধে বারবার পরাজিত হয়েও ধর্মপাল ভাগ্যের জোরে কনৌজকে নিজের অধীনে রাখতে পারলেও তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয়েছিল । এই সুযোগে সামন্ত রাজারা স্বাধীনতাকামী হয়ে উঠে পাল সাম্রাজ্যের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় ।

✍ কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রকৃতি ও স্বরূপ ঃ পালরাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে কৈবর্ত জাতিভূক্ত দিব্যের (দিব্ব বা দিবোক) বিদ্রোহ প্রাচিন বাংলার ইতিহাসে কৈবর্ত বিদ্রোহ নামে পরিচিত । এই বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে পরস্পর বিরোধী মতবিরোধ আছে । কৈবর্ত বিদ্রোহ শুধুমাত্র একটি রাজবংশের পরিবর্তন সূচীত করেছিল, না একটি গণবিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়েছিল, কিংবা সামন্তরাজাদের এক সুসংগঠিত অভ্যুত্থান ছিল কিনা তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হয়নি । এই বিতর্কের কারণ এসম্পর্কে উপাদানের স্বল্পতা । দ্বিতীয় মহীপালের পতন ও দিব্যের অভ্যুত্থান সম্পর্কে একটিমাত্র ঐতিহাসিক উপাদান ছিল সন্ধ্যাকর নন্দীর লেখা ‘রামচরিত’ কাব্য । এছাড়াও কুমার পালের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কামাউলি পট্ট, মদনপালের মানাহালি পট্ট ও ভোজবর্মনের বেলবা পট্ট থেকে কৈবর্ত বিদ্রোহের কথা জানা যায় ।

সন্ধাকর নন্দীর ‘রামচিত’-এর কয়েকটি শ্লোকে দিব্য দ্বারা দ্বিতীয় মহীপালের হত্যা এবং দিব্যের এই কাজ সম্পর্কে মন্তব্য ও রামপাল কর্তৃক দিব্যের ভাতুষ্পুত্র ভীমকে নিহত করে বরেন্দ্রীর সিংহাসন উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে । মহীপাল ছিলেন অত্যাচারী শাসক, তাঁর কুশাসনে অতিষ্ট হয়ে তাঁরই অধীনস্থ সামন্তশ্রেণীর কৈবর্তরা বিদ্রোহ ঘোষনা করেন । বিনা প্রস্তুতিতে মহীপাল যুদ্ধযাত্রা করে পরাজিত ও নিহত হন । সামন্তদের নেতৃত্বদানকারী কৈবর্ত জাতীয় দিব্য বারেন্দ্রীর সিংহাসনে বসেন ।

কিন্তু কৈবর্ত বিদ্রোহের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রশ্নে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে কৈবর্ত কারা ? ডঃ এস.পি. লাহিড়ী, পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ কৈবর্ত বলতে চাষী কৈবর্ত বা বাংলার চাষী কৃষক বা জমির মালিকদের বুঝিয়েছেন । তাঁর মতে, কৈবর্তরা ছিলেন বাংলার শক্তিশালী যুদ্ধপ্রিয় এবং কৃষিজীবী সম্প্রদায় । কিন্তু ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন কৈবর্ত বলতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে বুঝিয়েছেন । তাঁর মতে বৌদ্ধ পাল রাজাদের অহিংসা নীতির জন্য মৎস্যজীবী কৈবর্তদের জীবিকার অসুবিধা হওয়ায় তারা অসন্তুষ্ঠ ছিল । শূরপাল ও রামপাল বন্দী হলে তাঁরা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে । ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ও কৈবর্তদের মৎস্যজীবী বলে অভিহিত করেছেন ।

ডঃ সেনের প্রদত্ত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন ডঃ আব্দুল মোমিন চৌধুরী । তিনি বলেছেন, পাল রাজারা সাধারণত সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উদার মনোভাব দেখাতেন । তখন মহাযান বৌদ্ধধর্ম, তন্ত্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি রূপে প্রায় হিন্দু ধর্মের কাছে চলে এসেছিল । উভয় ধর্মের মধ্যে কার্যত কোন বিরোধ ছিল না । সুতরাং দ্বিতীয় মহীপাল বৌদ্ধ ছিলেন বলে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতন করবেন বলে মনে হয় না । সবচেয়ে বড়কথা, দিব্যই যে বিদ্রোহী সামন্তদের নেতৃত্ব দেন, এরকম কোন প্রমাণ সন্ধাকর নন্দীর রচনায় নেই । এমন হতে পারে যে সামন্তরা বিদ্রোহ করার আগেই দিব্য কৈবর্তদের বিদ্রোহে নায়ত্ব দেন এবং কৈবর্ত বিদ্রোহ আগেই ঘটেছিল ।

দিব্যের সিংহাসন অধিকারের ঘটনাকে সন্ধ্যাকর নন্দী বলেছেন ‘দস্যুদের মত’। কিন্তু দিব্যের বিদ্রোহ সম্পর্কে সন্ধাকর নন্দীর মন্তব্য অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য নয় । পাল বংশের আশ্রিত এই লেখকটি দিব্যকে ‘দস্যু’ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি । দিব্য নিজে সিংহাসনে না বসে যদি রামপালকে সিংহাসন ছেড়ে দিতেন তবে বংশানুক্রমিক ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা হত । কিন্তু রামপাল যদি সর্বসম্মত ও

ন্যায্য প্রার্থী হবেন তাহলে দ্বিতীয় মহীপালের পতনের পর সামন্ত শ্রেণী কেন তাঁকে সমর্থন জানাননি । কৈবর্ত দিব্য বিনা প্রতিবাদে সিংহাসনে কি করে বসতে পারেন । অথচ রামপালের স্বার্থে এই বিদ্রোহ হয় এমন মনে করার কারণ নেই ।

ডঃ আর.সি. মজুমদার দিব্যের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন যে, 'আর পাঁচটা সাধারণ বিদ্রোহের মতই দিব্যের বিদ্রোহ ছিল দুর্বল রাজার বিরুদ্ধে সামন্ত বিদ্রোহ । এটা ছিল পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাঙনের একটা অঙ্গ'। দিব্য কোন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জনসাধারণকে দ্বিতীয় মহীপালের কুশাসন থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন, একথা ডঃ মজুমদার মনে করেন না । অর্থাৎ দিব্যের বিদ্রোহ ছিল একটি নিছক সামন্ত বিদ্রোহ । দিব্যের পিছনে জনসমর্থন ছিল বলেও তিনি মনে করেন না । রামচরিতের 'মিলিতান্তক সামন্ত চক্র' তত্ত্বকেই ডঃ মজুমদার মেনে নিয়েছেন ।

সুতরাং কৈবর্ত বিদ্রোহের স্বরূপ নির্ণয়ে তাই আমরা দেখতে পাই এতে গণজাগরণের কিছু ইঙ্গিত থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এর সামাজিক তাৎপর্যকে গুরুত্ব দেননি । তবে এটা প্রমাণ করে যে, তৎকালীন বাংলাদেশে সামন্ততান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদ রাষ্ট্রের পক্ষে কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল । নিছক গোষ্ঠীগত আকাঙ্খা থেকে গড়ে ওঠা এই বিদ্রোহ ছিল নিস্ফলা ও ক্ষণস্থায়ী । রামচরিতে যে 'মিলিতান্তক সামন্ত চক্র'-এর কথা বলা হয়েছে, তা দীর্ঘকাল মিলিত অবস্থায় ছিল না । সামন্তরা প্রাথমিক ভাবে রাজার বিরুদ্ধর গেলেও শেষ পর্যন্ত সামন্তদের সাহায্য নিয়েই রামপাল বারেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করেছিলেন । ডঃ মজুমদার তাই যথার্থই বলেছেন, 'এই বিদ্রোহকে পাল শক্তির পতনের কারণ হিসাবে না দেখে তার ফল হিসাবে দেখা উচিত'।

✍ রাজপুত জাতির উৎপত্তির ইতিহাস ঃ হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে যে সব শক্তিশালী রাজ্যের উত্থাণ ঘটেছিল তাদের মধ্যে রাজপুত জাতি-রাজ্যগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । বস্তুত ভারতে মুসলিম বিজয়ের আগে পর্যন্ত উত্তরভারতের রাজনীতিকে 'রাজপুতের যুগ' বলে অভিহিত করা হয় । এই সময় উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজপুত জাতির শাখা শাসন করত । বেশিরভাগ রাজপুত রাজ্যগুলি রাজপুতদের অধিকারে ছিল ।

রাজপুত জাতির উৎপত্তি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন মত আছে । রাজপুত কিংবদন্তি অনুসারে সূর্য বা চন্দ্র বংশ বা বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত বংশ মর্যাদা দাবী করা হয় । প্রচলিত অর্থে 'রাজপুত্র' শব্দটির অপভ্রংশ হিসাবে রাজপুত শব্দটি এসেছে । বাণভট্টের মতে, উচ্চবংশজাত ক্ষত্রিয়কে 'রাজপুত' বলা হত । সুতরাং বাণভট্টের মতে, ৭ম খ্রিঃ রাজপুতদের কোন উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছিল বলে জানা যায় । কবি চাঁদ বরদাই তাঁর 'পৃথবীরাজ রসো' কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে পারমার, চৌহান, প্রতিহার প্রভৃতি রাজপুতরা আবু পাহাড়ে বশিষ্ঠের যজ্ঞকুন্ড থেকে জন্মলাভ করেছিল । এই তত্ত্বকে 'অগ্নিকুল তত্ত্ব' বলা হয় ।

ঐতিহাসিক মহলে যদিও অগ্নিকুল তত্ত্বের সমালোচনা করা হয় । কারণ বলা হয় যে রাজপুতরা বৈদেশিক বংশজাত বলেই তাদের যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধ করা হয় । এরদ্বারা প্রমাণ করা যায় যে রাজপুতরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীর লোক ছিলেন না । তাছাড়া 'পৃথবীরাজ রসো' কাব্যে বহু ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি ঘটেছে । ব্রাহ্মণ কবি চাঁদ বরদাই তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজবংশগুলির গুণগান করার জন্য উচ্চবংশ ও বশিষ্ঠের যজ্ঞকুন্ডের কথা বলেছেন । এর কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই । রাজপুতনায় প্রাপ্ত 'পান্ড্যলিপি' 'অগ্নিকুল তত্ত্ব'-কে সমর্থন করে না । 'গুহিলোট লিপি' থেকে জানা যায় এক ব্রাহ্মণ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন । সুতরাং অগ্নিকুল তত্ত্ব'-কে অধিকাংশ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন না ।

'হিস্ট্রী অফ রাজপুতানা' গ্রন্থে ডঃ গৌরীশঙ্কর ওঝা কিংবদন্তি ও নৃতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে দেখিয়েছেন যে রাজপুতরা খাঁটি আর্য জাতির লোক ছিল । তিনি নিজের মতের স্বপক্ষে যুক্ত দিয়েছেন এই যে রাজপুতদের সূর্য পুজো, সতীদাহ প্রথা, জহর ব্রত প্রথা প্রভৃতি প্রমাণ করে রাজপুতজাতি আর্য আচার দৃঢ়ভাবে পালন করে । তাঁরা এমনকি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন । তারচেয়েও বড়কথা তাঁরা হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা রক্ষার জন্য মুসলিম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল । তাছাড়া নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষায় রাজপুতদের শারীরিক গঠন আর্য জাতির মতই বলে জানা যায় ।

কর্নেল টড, উইলিয়াম ক্রুক প্রমুখ ঐতিহাসিক বলেন যে রাজপুতরা ছিল শক, হূণ ও গুর্জরদের বংশধর । এদের মধ্যে যারা উচু শ্রেণির ছিল তারাই রাজপুত নামে পরিচিত । উইলিয়াম ক্রুকের মতে, বৈদিক ক্ষত্রিয় ও রাজপুতদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায় । হূণ আক্রমণের ফলে ভারতীয় সমাজে বহু পরিবর্তন দেখা দেয় ।নতুন সমাজ ও জাতি গঠন হয়, যার মধ্যে দিয়ে রাজপুত জাতির গঠন হয় । ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সভ্যতার প্রচারে সম্পূর্ণ ভারতীয় হয়ে যায় । এদের মধ্যে যারা শাসক জাতিতে পরিণত হয়, তাদের নাম হয় রাজপুত ।

✍ রাষ্ট্রকূট শাসনব্যবস্থা ঃ দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে রাষ্ট্রকূট বংশের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । রাষ্ট্রকূটরা কেবল রাজ্যবিস্তারেই মনোনিবেশ করেনি, একইসঙ্গে তাঁরা একটি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থাও প্রবর্তন করেছিলেন । শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন রাজা,

সকল ক্ষমতার উৎস হিসাবে রাজা গণ্য হতেন । তিনি 'পরমেশ্বর','পরম ভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করতেন । অত্যন্ত জাঁকজমক ও আড়ম্বরের সঙ্গে রাজা তাঁর প্রাসাদে বাস করতেন । দামি পোষাক পরে, অলঙ্কার ধারণ করে, যুবতী নারী বেষ্টিত হয়ে সিংহাসনে বসতেন । মন্ত্রী, সভাসদ ও কর্মচারীরা দরবারে সর্বদা হাজির থাকতেন।

সিংহাসনে আরোহণের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক রীতি প্রচলিত ছিল এবং সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনে বসতেন । কখনো কখনো কনিষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনীত করা হত । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র তৃতীয় গোবিন্দকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন । রাজাকে শাসনকার্যে যুবরাজ সাহায্য করতেন । মন্ত্রীরা শাসনের দায়িত্বে থাকতেন । রাজ্যের অভিজাত ও ক্ষমতা শালী লোকেদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী নিয়োগ করা হত । প্রধানমন্ত্রী, রাজস্বমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর নাম থাকলেও নিয়মিত বেতনভোগী কর্মচারী ছিল কিনা জানা যায় না । তবে সামন্তরাজারাই শাসনের দায়-দায়িত্ব বহন করতেন ।

সম্রাটের প্রত্যক্ষ শাসনে সাম্রাজ্যের কিছু অংশ শাসিত হত । আর বাদবাকি অংশ সামন্তরাজারা শাসন করতেন । তাঁরা রাজাকে নিয়মিত কর ও প্রয়োজনে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন । এসবের বিনিময়ে সামন্তরাজারা স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার ভোগ করত । সামন্ত রাজাদের রাজ্যে রাজা সাধারণত হস্তক্ষেপ করতেন না । সামন্ত রাজারা তাদের রাজ্য অধীনস্থ সামন্তদের কাছে বন্দোবস্ত দিতেন । রাজার প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চলকে রাষ্ট্র বা বিষয়ে ভাগ করা হয় । বিষয়গুলিকে ভুক্তিতে এবং ৫০-৬০টি গ্রাম নিয়ে ভুক্তি গঠিত হত ।

প্রাদেশিক শাসনের ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্রের শাসনকর্তাকে 'রাষ্ট্রপতি' বলা হত । বিষয়ের শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'বিষয়পতি'। রাষ্ট্রপতি সামরিক ও সকল প্রকার ক্ষমতা ভোগ করতেন । আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, রাজস্ব আদায়, বিচার ব্যবস্থা রক্ষা ছিল তাঁর দায়িত্ব । বিদ্রোহ দমনের কাজে তাকে ব্যস্থ থাকতে হত । বিষয়পতিরও অনুরূপ দায়িত্ব ছিল । বিষয়পতিকে এক শ্রেণির বংশানুক্রমিক গ্রামের কর্মচারী রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করতেন । আর গ্রামের শাসন পরিচালনা করতেন গ্রামপ্রধানরা । পাহারাদারদের সাহায্যে গ্রাম প্রধান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন । তবে গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে গ্রামপ্রধান 'গ্রাম-মহাজন' বা 'গ্রাম-সহত্তর' নামক গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন । কোন কোন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন, পুষ্করিণী সংস্কার, মন্দির ও রাস্তাঘাট তদারকির জন্য পৃথক পৃথক সমিতি থাকত ।

রাষ্ট্রকূট শাসনে ভূমিরাজস্ব ছিল রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস । ফসলের ১/৪ অংশ রাজস্ব আদায় করা হত, যা 'ভাগ' নামে পরিচিত। রাষ্ট্রকূট রাজ্যে প্রচলিত করগুলি ছিল ভোগ, শুল্ক, বিষ্টি, উদরঙ্গ, উপরিকর, সিদ্ধায় প্রভৃতি । 'দেশগ্রামুক্ত' নামে রাজস্ব কর্মচারিদের উপর কর আদায়ের ভার ন্যস্ত থাকত । রাজস্ব কর্মচারিরা বংশানুক্রমিক ভাবে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে প্রায়শঃ তাদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে । এমনকি রাজার পক্ষেও এদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা সম্ভব ছিল না । রাষ্ট্রকূটদের শক্তিশালী সেনাদল ছিল এবং এরা রাজধানী ও রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মোতায়েন থাকত । পদাতিক ও অশ্বারোহী ছিল রাষ্ট্রকূট সেনার মেরুদন্ড ।

✍ **সেন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজয় সেনের ভূমিকা ঃ** পাল বংশের অবক্ষয় ও পতনের সুযোগ গ্রহণ করে সেনরা একাদশ শতকে বাংলাদেশে এক স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন । সেন সাম্রাজ্যের পতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজয় সেনের নাম করতে হয় । হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাঢ়দেশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে নিজ যোগ্যতায় এক সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন । বিক্রমপুর তাম্রপট্ট ও দেওপাড়া লিপি থেকে তাঁর সম্পর্কে জানা যায় । সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় অপার-মন্দারে লক্ষ্মীশূর নামে একজন পরাক্রান্ত সামন্ত রাজা ছিলেন । শূরবংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করে বিজয় সেন রাজনৈতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রামপালের মৃত্যুর পর পালবংশের দুর্বলতার সুযোগে বিজয় সেন সাম্রাজ্য সীমা বৃদ্ধি করতে তৎপর হন । দক্ষিণে উড়িষ্যার রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন । আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিতে বিজয় সেনকে 'চোড়গঙ্গসখা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি মিথিলার রাজা নান্যদেবকে কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত করে উত্তর বাংলায় মিথিলার আধিপত্য স্থাপনের সম্ভাবনা দূর করেন । তিনি বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ জঙ্গলমহলের কোটাটবীর রাজা বীরসেনকে পরাস্ত করেন । এরপর তিনি গৌড় বা উত্তর বাংলার রাজা মদন পালকে গৌড় থেকে বিতাড়িত করেন ।

দেওপাড়া লিপি থেকে জানা যায় গৌড়ের উপর বিজয় সেন চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করতে পারেননি । এরপর তিনি গৌড় থেকে পূর্ব দিকে পূর্ব বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন । তিনি পূর্ব বাংলা থেকে কামরূপ বা আসামের একাংশ জয় করেন । অনেকে মনে করেন বিজয় সেন কামরূপ জয় করার পরিবর্তে কামরূপ রাজ্যের আক্রমণ প্রতিহত করেন । দক্ষিণে কলিঙ্গের কিছু অংশ তিনি জয় করেন । এরপর তিনি পশ্চিমে মগধ বা বিহারের দিকে অগ্রসর হন । বাংলা থেকে এক নৌবহর গঙ্গার খাত বেয়ে মগধ অভিযান করে মগধের কিছু অংশ দখল করেন । দেওপাড়া লিপি থেকে এটা জানা যায় ।

সেন সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে দুটি স্থান পরিচিত ছিল । একটি ছিল রাজা বিজয় সেনের নিজের নামঙ্কিত বিজয়পুর এবং অপরটি ছিল বিক্রমপুরে । ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে গঙ্গার পশ্চিম তীরে ত্রিবেনীর কাছে বিজয়পুর অবস্থিত বলা হয়েছে । আবার 'তবাকৎ-ই-নাসিরী'-র লেখক মিনহাজউদ্দিন সিরাজের নওদীয়া (নদীয়া) বা বর্তমান নবদ্বীপের সঙ্গে একে অভিন্ন বলেও কোন কোন ঐতিহাসিক মনে

করেন । তবে সেনদের প্রধান রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, কারণ বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালের প্রথম দিকের সমস্ত তাম্রশাসনই পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে পাওয়া গেছে । লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল লক্ষ্মণাবতী ।

বিজয় সেনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় তিনি সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন । পাল যুগের শেষে বাংলায় যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় বিজয় সেন তা দূর করেন । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেছেন, বিজয় সেন কঠোর শাসনের প্রবর্তন না করলে বাংলাদেশে পুনরায় অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের প্রার্দুভাব ঘটত । তাই বাংলার ইতিহাসে বিজয় সেনের রাজত্বকাল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । তবে গোপালের মত তিনি অরাজকতার অবসান ঘটালেও গোপালের মত সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হননি । বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতা দখল করেছিলেন । বাঙালিদের সঙ্গে সেনরাজাদের ততটা যোগাযোগ ছিল না । হয়তো এই কারণেই দেখা যায় উমাপতি ধর, শ্রীহর্ষ প্রমুখ রাজকীয় দাক্ষিণ্যপুষ্ট কবিগণ সেন রাজাদের যশ কীর্তন করলেও রাজাদের নামে কোন লোকগীতি রচনা করেননি ।

✍ ইখতিয়ার উদ্দিন বক্তিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা জয় ঃ বাংলায় সেন বংশের শাসনকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল বক্তিয়ার খলজির বাংলা জয় । মিনহাজউদ্দিন সিরাজের 'তবাকৎ-ই-নাসিরি' গ্রন্থ থেকে বক্তিয়ার খলজির এই তথাকথিত বাংলা বা নদীয়া জয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় । মিনহাজ বাংলা জয়ের অর্ধ শতক পরে সামসুদ্দিন নামে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সেনার কাছ থেকে বক্তিয়ার খলজির বাংলা জয়ের বিবরণ সংগ্রহ করেন । এছাড়া ফেরিস্তার 'তারিখ-ই-ফেরিস্তা' এবং হাসান নিজামীর 'তাজ-উল-মাসির' থেকেও কিছু বিবরণ পাওয়া যায় । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যদিও মিনহাজের বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । কারণ মিনহাজ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বিবরণ দেননি ।

১২০৩-০৫ খ্রিঃ মধ্যে বক্তিয়ার খলজি বিহার জয় করে বাংলার সীমান্তে এসে পড়েন । ৮০ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন বা রায় লখমনিয়া তাঁর ধর্ম-কর্ম ও জ্যোতিষচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় প্রকৃতভাবে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি করতে অবহেলা করেন । তিনি বক্তিয়ারের আক্রমণের সামনে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জ্যোতিষীদের কাছে জানতে চাইলে জ্যোতিষীরা তাঁকে তুর্কিদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য রাজধানী ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন । তিনি এমনকি 'ঐন্দ্র মহাশান্তি' যজ্ঞ করে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন ।

মিনহাজের মতে, ১২০৫ খ্রিঃ বক্তিয়ার তাঁর বাহিনী নিয়ে বাংলার রাজধানী নদীয়া বা নবদ্বীপের দিকে এগিয়ে চলেন । তিনি এত দ্রুত ঘোড়া ছোটান যে মাত্র ১৭জন অশ্বারোহী তাঁর সঙ্গে একতালে চলতে পারে । তাঁর পেছনে মূল বাহিনী আসতে থাকে । নদীয়ার নগর দরজায় এসে তিনি কাউকে আক্রমণ না করে ১৭জন অনুচরসহ রাজপ্রাসাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন । লোকে তাদের ঘোড়া বিক্রেতা বলে মনে করে কোন বাধা দেয়নি । কিন্তু রাজপ্রাসদের মূল ফটক পার হয়ে বক্তিয়ার রক্ষীদের আক্রমণ করেন । এই সময় লক্ষ্মণ সেন মধ্যহ্ন ভোজনে বসেছিলেন । গোলমালের শব্দ পেয়ে তিনি জানতে পারেন যে তুর্কি সেনা প্রাসাদ আক্রমণ করেছে । তাই আর কালবিলম্ব না করে তিনি খালি পায়ে খিড়কি দরজা দিয়ে বজরায় চেপে পূর্ব বাংলায় পালিয়ে যান।

লক্ষ্মণ সেনের পলায়নে তাঁর ধন সম্পদ, প্রজাবর্গ ও পরিজন, দাস-দাসীদের বক্তিয়ার খলজি অধিকার করেন । ইতিমধ্যে বাকি তুর্কি সেনাও প্রাসাদে প্রবেশ করে । তুর্কি সেনাদল নির্বিচারে লুঠ করে বহু ধনরত্ন পায় । বক্তিয়ার নদীয়াকে তাঁর নববিজিত রাজ্যের রাজধানীর উপযুক্ত মনে না করে লক্ষ্মণাবতীকে তাঁর রাজধানী হিসাবে মনোনয়ন করেন । বক্তিয়ার খলজি উত্তর বাংলায় তাঁর আধিপত্যকে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় করেন । আসল কথা নদীমাতৃক দক্ষিণ বাংলা বক্তিয়ারের কাছে ছিল অনেকটা অপরিচিত ও অসুবিধাজনক স্থান ।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন ১৭ বা ১৮জন সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হবার তত্ত্বটি সঠিক নয় । বক্তিয়ারের সঙ্গে একটি বড় অশ্বারোহী বাহিনী ছিল, আর সেন রাজাদের সৈন্যবাহিনী ছিল তাদের প্রধান রাজধানী বিক্রমপুরে । ১৮জন অশ্বারোহীর প্রাসাদ দখলের মুহূর্তেই প্রাসাদবাসীরা নগরের মধ্যে ভীত মানুষদের কোলাহল শুনতে পেয়েছিল । তাছাড়া বক্তিয়ার ১৭জন সেনা নিয়ে অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে নগরে প্রবেশ করেন । তখন এদেশে উন্নত মাণের ঘোড়া ছিল না, তাই বিদেশি অশ্ববিক্রেতারা বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করতে পারত । তাই বলা যায় বক্তিয়ার যুদ্ধের পরিবর্তে চাতুরীর দ্বারা নদীয়া জয় করেন । তবে লক্ষ্মণ সেন সত্যিই কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়েছিলেন কিনা ইতিহাসে একটি বিতর্কিত বিষয় হিসাবেই হয়ে গেছে ।

✍ রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের কৃতিত্ব ঃ রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম ধ্রুব এবং তৃতীয় গোবিন্দের শাসনকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । দন্তিদূর্গ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকূট রাজবংশের বিস্তৃতিতে প্রথম ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের ভূমিকা কম নয় । দ্বিতীয় গোবিন্দের পর ৭৮০ খ্রিঃ নাগাদ ধ্রুব সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন । তিনি দাক্ষিণাত্যের বিশাল অঞ্চলে রাষ্ট্রকূট প্রাধান্য স্থাপন করেন । তিনি তাঁর পূর্ববর্তী শাসক দ্বিতীয় গোবিন্দের গোষ্ঠীভূক্ত কর্মচারী ও সামন্তদের দমন করে তাঁর ক্ষমতাকে দৃঢ় করেন । এজন্য তিনি গঙ্গ রাজা শ্রীপুরুষ মুত্তারসকে পরাস্ত করেন এবং গঙ্গবাদী বা মহীশূর নিজ রাজ্যভূক্ত করেন । পল্লব রাজা দন্তিবর্মনকে, বেঙ্গীর পূর্ব চালুক্য শক্তিকে পুনরায় পরাস্ত করেন ।

উত্তর ভরতে অভিযান ছিল রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের প্রধান কৃতিত্ব । এই সময় উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় উপত্যকায় ক্ষমতা দখলের জন্য পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব চলছিল । এই ঘটনায় ধ্রুব উপলব্ধী করেন যে পালদের হারিয়ে প্রতিহার শক্তি যদি একাধিপত্য পায় তাহলে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠবে । গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশ থেকে রাষ্ট্রকূটদের বিতাড়িত করতে উদ্যত হতে পারে । তাই শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য ধ্রুব পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্বে যোগ দিয়ে ত্রিশক্তি সংগ্রামের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটান । ধ্রুবের এই নীতি এমনকি তাঁর বশংধরদের আমলেও প্রচলিত ছিল । ধ্রুব প্রতিহাররাজ বৎসরাজকে পরাস্ত করে গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে এগিয়ে যান এবং বাংলার ধর্মপালকেও পরাজিত করেন ।

ধর্মপাল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলে ধ্রুবের পক্ষে যুদ্ধ জয় সহজ হয় । তিনি এই জয়কে স্মরণীয় রাখতে তাঁর পতাকায় গঙ্গ-যমুনা প্রতীক নেন । ৭৯০খ্রিঃ ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরে আসেন । উত্তর ও দক্ষিণের সকল রাজা তাঁর প্রাধান্য স্বীকার করায় তিনি একঅর্থে সার্বভৌম ক্ষমতার অধীশ্বর হন । তিনি ‘ধ্রুব নিরুপম’, ‘ধ্রুব ধরাবর্ষ’, ‘শ্রীবল্লভ’ প্রভৃতি উপাধি নেন । তাঁর রাজত্বকালেই রাষ্ট্রকূট শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে । তাঁর প্রধানা মহিষী ছিলেন বেঙ্গীর রাজকন্যা শিল ভট্টারিকা । আনুমানিক ৭৯৩ খ্রিঃ ধ্রুবের মৃত্যু হয় ।

রাষ্ট্রকূট বংশ তথা সাম্রাজ্যের অপর এক শক্তিশালী রাজা ছিলে তৃতীয় গোবিন্দ । ধ্রুবের মৃত্যুর পর তৃতীয় গোবিন্দ রাষ্ট্রকূট সিংহাসনে বসেন । তাঁর পিতার মতই তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখতেন । এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি ভূপাল ও ঝাঁসির মধ্য দিয়ে কনৌজের দিকে অগ্রসর হন । প্রতিহাররাজ নাগভট্টকে পরাস্ত করে তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে প্রতিহারদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে দূর করেন । বাংলায় ধর্মপাল ও তাঁর সামন্ত চক্রায়ুধকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন । রাষ্ট্রকূট লিপিতে উল্লেখিত আছে যে তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতের আরও বহু রাজাকে পরাজিত করেন এবং হিলাময় পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন ।

দাক্ষিণাত্যে ফেরার পথে তৃতীয় গোবিন্দ মালব, কোশল, কলিঙ্গ, বেঙ্গী প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে নিজ বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন । উত্তর ভারতে ব্যস্ত থাকার সুযোগে বেঙ্গীর চালুক্য রাজা বিজয়াদিত্য বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তৃতীয় গোবিন্দ তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর ভাই ভীমসেনকে সিংহাসনে বসান । তিনি এমনকি বিদ্রোহীদের দমন করে পল্লব রাজধানী কাঞ্চী অধিকার করেন । সিংহলের রাজাও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন । বস্তুত তৃতীয় গোবিন্দ ছিলেন অত্যন্ত শক্তীশালী রাজা, কোন শত্রুর হাতে তিনি কখনো পরাজয় বরণ করেননি । হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত নিজের বিজয় পতাকা স্থাপন করেছিলেন । রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে তাঁকে গণ্য করা যায় ।

✍ প্রতিহাররাজ মিহিরভোজের কৃতিত্ব ঃ প্রতিহার বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে প্রথম ভোজের নাম বিশেষভাবে স্বীকৃত । রামভদ্রের পুত্র প্রথম ভোজ ৮৩৬ খ্রিঃ প্রতিহার সিংহাসনে আরোহণ করেন । ইতিহাসে প্রথম ভোজ ‘মিহিরভোজ’ নামেই পরিচিতি লাভ করেছেন । তাঁর রাজত্বকালে প্রতিহার শক্তি চূড়ান্ত সীমায় পৌছায় । মিহিরভোজ সর্বপ্রথম প্রতিহার শক্তিকে দৃঢ় করার কাজে হাত দেন । বুন্দেলখন্ড ও রাজপুতানার প্রতিহার শক্তির যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তিনি তা দূর করেন । ইতিমধ্যে দ্বিতীয় নাগভটের পর হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া রাজ্য তিনি পুনরুদ্ধার করেন । এথেকে প্রমাণিত হয় যে মিহিরভোজ তাঁর পৈতৃক রাজ্যের উপর পূর্ণ অধিকার স্থাপন করেন ।

এরপর তিনি পূর্বদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁর পূর্ব পুরুষদের মতই হাত বাড়ান । কালিঞ্জর, দক্ষিণ রাজপুতানা অধিকার করে কনৌজে তাঁর আধিপত্য স্থাপন করেন । পাল সম্রাট দেবপাল গুর্জর-প্রতিহার শক্তিকে বাধা দিতে অগ্রসর হন । দেবপালের পরাক্রান্ত নীতিতে মিহিরভোজ পিছিয়ে আসতে বাধ্য হন । বরং তিনি দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়ে দাক্ষিণাত্যে অভিযানে চেষ্টা করেন । কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের নিকট তিনি পরাস্ত হন । ইতিমধ্যে দেবপালের মৃত্যু হলে পাল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । রাষ্ট্রকূট শক্তি পূর্ব চালুক্যদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্থ থাকায় মিহিরভোজ পুনরায় পূর্বদিকে অগ্রসর হন ।

কনৌজ জয় করার সুবর্ণ সুযোগ মিহিরভোজের সামনে উপস্থিত হয় । কিন্তু ইতিপূর্বে কনৌজে দেবপালের হাতে পরাজয়ের গ্লানি তিনি ভুলতে পারেননি । তাই গোরক্ষপুরের চেদি এবং গুহিলোৎ শক্তির সঙ্গে জোট বেধে তিনি কনৌজ জয়ে অগ্রসর হন । বিশাল শক্তি নিয়ে মিহিরভোজ নব উদ্যমে পাল শক্তিকে আক্রমণ করে কনৌজ অধিকার করেন । এমনকি রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণকে পরাজিত করে মালব ও গুজরাটের একাংশ জয় করে নেন । রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ পরবর্তীতে সৈন্য নিয়ে মিহিরভোজকে বাধা দিলে উজ্জয়িনীর যুদ্ধে ভোজ রাষ্ট্রকূট শক্তিকে প্রতিহত করেন । এইভাবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করে মিহিরভোজ সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন ।

মিহিরভোজ উত্তরে পাঞ্জাব ও অযোধ্যা জয় করেন বলে জানা যায় । কাশ্মীরের শঙ্কর বর্মনের বাধায় অবশ্য তিনি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি । মিহিরভোজের সাম্রাজ্য কাশ্মীর, সিন্ধু, বিহার, বাংলা ও জব্বলপুরের কলচুরী রাজ্য ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে বিস্তৃত ছিল । পূর্বে বাংলার পালশক্তি ও পশ্চিমে সিন্ধুর আরব শক্তি ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের দুই সীমা । ভোজ তাঁর রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন । ৮৫১ খ্রিঃ আরব পর্যটক সুলেমান মিহিরভোজের রাজধানীতে আসেন । তিনি মিহিরভোজের সামরিক শক্তি ও শাসন ব্যবস্থার প্রশংসা করেন ।

পরিশেষে প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ বা মিহিরভোজের কৃতিত্বের প্রসঙ্গে আরব পর্যটক সুলেমান বলেছেন, 'ভোজের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল শক্তিশালী । তাঁর রাজ্য ছিল সমৃদ্ধশালি ও ধনসম্পদে পূর্ণ । দস্যু-তস্করের ভয় তাঁর রাজ্যে ছিলনা । ভোজ আরব আক্রমণকারীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু ।' ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ভোজ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'ভোজের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করতে মেগাস্থিনিস বা বাণভট্টের মত কাউকে পাওয়া যায়নি এটা দুর্ভাগ্য ।' প্রথম ভোজের মুদ্রা ও গোয়ালিয়র লিপি থেকে জানা যায়, ভোজ ছিলেন বিষ্ণুর উপাসক । তিনি সুদক্ষ যোদ্ধা ও সমরকুশলী সেনানায়ক ছিলেন ।

✍ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলোকেশীর কৃতিত্ব ঃ বাতাপির চালুক্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন দ্বিতীয় পুলোকেশী । পিতৃব্য মঙ্গলেশের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে দ্বিতীয় পুলোকেশী সিংহাসন লাভ করেন । এই সময় গৃহযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যেসব বিদ্রোহ দেখা দেয়, পুলোকেশী কঠোর হাতে তা দমন করেন । দ্বিতীয় পুলোকেশী সম্পর্কে জানার অন্যতম উপাদান হল তাঁর সভাকবি রবিকীর্তি রচিত 'আইহোল প্রশস্তি'।

দ্বিতীয় পুলোকেশী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী, তিনি তাঁর প্রতিবেশী রাজ্যগুলি দখল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । দক্ষিণের মহীশূরের গঙ্গ রাজ্য, মালাবারের অলুপ অঞ্চল জয় করেন । কোঙ্কনের মৌর্য রাজ্যটিও তিনি জয় করেন এবং মৌর্য রাজধানী পুরী অধিকার করেন । অতপর তিনি গুজরাট আক্রমণ করে বলভীকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, গুজরাট জয় ছিল পুলোকেশীর জীবনে একটি বিরাট ঘটনা । কারণ, এরফলে উত্তর ভারতের সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে পুলোকেশীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আড়ম্ভ হয়। গুজরাট, মালব বা রাজপুতানার উপর হর্ষবর্ধন আক্রমণের উদ্যোগ দেখালে পুলোকেশী তাঁকে বাধা দেন । হর্ষবর্ধনকে যুদ্ধে পরাজিত করে দ্বিতীয় পুলোকেশী 'পরমেশ্বর' উপাধি গ্রহণ করেন ।

দাক্ষিণাত্যের পূর্বভাগে ও সুদূর দক্ষিণেও পুলোকেশী আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন । পূর্বদিকে গোদাবরী জেলার পিঠাপুরম জয় করে এলপোর ও কুনাল পর্যন্ত এগিয়ে যান । কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চল তিনি বিষ্ণুবর্ধনের অধীনে রাখেন । অতপর দ্বিতীয় পুলোকেশী তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করে সুদূর দক্ষিণে ঢুকে পড়েন । এইসময় দক্ষিণে পল্লবরা খুব শক্তিশালী ছিলেন, এরফলে চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে । পুলোকেশী প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করে রাজধানী কাঞ্চী নগরীকে বিধ্বস্ত করেন । আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে চোলদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন ।

আইহোল প্রশস্তি থেকে জানা যায় চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্ব মহেন্দ্র বর্মনের পরে আরও তীব্রতর হয় । ডঃ মহালিঙ্গমের মতে, প্রথম নরসিংহ বর্মন তাঁর রাজত্বের গোড়ার দিকে দ্বিতীয় পুলোকেশীর হাতে পরাজিত হন । কিন্তু পুলোকেশী পুনরায় পল্লব আক্রমণ করলে নরসিংহবর্মন তাকে মনিমঙ্গলমের যুদ্ধে পরাস্ত করে তুঙ্গভুদ্রা পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে বাধ্য করেন । এমনকি পল্লবসেনা বাতাপি রাজ্যে আক্রমণ করে নগরী পুড়িয়ে দেন । সম্ভবত বাতাপির যুদ্ধে পুলোকেশীর মৃত্যু হয় । কারণ, এরপর পুলোকেশীর আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ।

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়েন সাঙ পুলোকেশীর রাজ্য ভ্রমণ করেছিলেন । তিনি পুলোকেশীর শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন । তাঁর মতে, পুলোকেশী দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী ও হস্তীবাহিনীর শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে গ্রাহ্য করতেন না । তাঁর রাজ্য যেমন ছিল বিশাল, পরিকল্পনাও ছিল বিশাল । তিনি বহু জনহীতকর কাজ করেছেন, প্রজাসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন । পুলোকেশীর সামন্ত রাজারাও তাঁর প্রতি পূর্ণ মাত্রায় আনুগত্য জানাতেন । ভারতের বাইরেও তাঁর খ্যাতি প্রসারিত হয়েছিল । ঐতিহাসিক টবরী উল্লেখ করেছেন যে পার্সিয়ার রাজা দ্বিতীয় খসরু চালুক্যরাজের দরবারে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করেছিলেন । সবদিকে বিচার করে দ্বিতীয় পুলোকেশীকে 'দক্ষিণাপথপতি' আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে ।

✍ চোলদের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা ঃ ঐতিহাসিকগণ চোল রাজাদের শাসনকালকে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে 'সুবর্ণ যুগ' বলে অভিহিত করেছেন । খ্রিষ্ঠিয় ১০ম শতক থেকে শুরু করে ১২দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় ২০০ বছর ধরে নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে চোলরা এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলে ছিলেন । চোলদের হাতে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল তা সমসাময়িক অন্যান্য সাম্রাজ্যে দেখা যায় না । চোল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হয় লেখ ও লিপির উপর । চোল আমলে পাওয়া মুদ্রা থেকেও চোল শাসনব্যবস্থার অনেক তথ্য পাওয়া যায় । তাছাড়া বৈদেশিক বিবরণ ও অসংখ্য স্থাপত্য নিদর্শন বিশেষ করে মন্দিরগুলি চোল শাসনের বৈশিষ্ঠ্য বা প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে আমাদের সাহায্য করে ।

চোলদের স্থানীয় শাসনের অন্যতম ভিত্তি ছিল গ্রাম । চোল গ্রামীণ শাসন এতই স্বাধীন ছিল যে রাজধানীতে রাজার পরিবর্তন হলেও গ্রাম শাসন তার নিজের নিয়মে চলত । গ্রামের শাসন চালাত গ্রামসভাগুলি । গ্রামের শাসনের জন্য বিভিন্ন ধরণের সভা ছিল । গ্রাম গুলিকে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা হত এবং প্রতিটি এলাকায় স্থানীয় সভা ছিল । এই সভায় বিভিন্ন বৃত্তির লোকেদের প্রতিনিধি থাকত । গ্রামে

বিভিন্ন গোষ্ঠী ছিল, যা সামাজিক ও ধর্মীয় ভিত্তিতে গঠিত হত । গোষ্ঠীগুলির কাজকর্ম দেখাশোনা করত গোষ্ঠী সমিতি । গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারত । সাধারণ সভা তিন প্রকারের ছিল, যথা- উর, সভা ও নগরম ।

গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ছিল উরের সদস্য, যদিও বর্ষীয়ানরাই উরের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করত । উরের সভাগুলির সদস্য সংখ্যা কত হত তা জানা যায়নি । গ্রামবাসী হিসাবে বা পরিবারের কর্তারা উরে যোগ দিত কিনা তাও জানা যায়নি । তবে গ্রামের প্রতি কুড়ুম্বু বা পাড়া থেকে প্রতিনিধি দ্বারা উর গঠিত হত । গ্রামের মাথা পিছু খাজনা ধার্য, আদায়, বাঁধ তৈরী, খাল খননের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি উরে নেওয়া হত । গ্রামের লোকেদের বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি উরে করা হত । আর ব্রাহ্মণ গ্রামগুলির সংগঠন 'সভা' নামে পরিচিত ছিল । চোল যুগে অগ্রহার, ঘেটিকা স্থাপন, মন্দির স্থাপন প্রভৃতি ব্যাপক ভাবে করা হত । ফলে রাজারা ব্রাহ্মণদের বহু ভূমিদান করতেন এবং বহু গ্রামে ব্রাহ্মণেরা সভায় যোগ দিত ।

উর ও ব্রাহ্মণ সভা নিয়ে সমিতি গঠন করা হত । উত্তর মেরু লিপি থেকে জানা যায় বিভিন্ন কুড়ুম্ব বা পাড়া থেকে সমিতি গঠনের জন্য যোগ্য লোকেদের মনোনীত করা হত । যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল বেশ কঠিন । নিজস্ব বাড়ি, ৩৫-৭০ বছর বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, কিছু জমির মালিক প্রভৃতি না থাকলে নির্বাচিত হওয়া যেত না । নৈতিক চরিত্র নির্মল না হলে, সমিতির টাকা-কড়ি আগে তছরুপ না করলে, পরদ্রব্য অপহরণের অপবাদ না থাকলে প্রার্থী হিসাবে যোগ্য মনে করা হত । প্রতি পাড়া থেকে মনোনীত ব্যক্তিদের একজনকে ভাগ্য পরীক্ষায় বেছে নেওয়া হত । সমিতির সদস্যগণ এক বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন এবং তাঁরা কোন বেতন পেতেন না ।

ঢোল বাজিয়ে সভা বা মহাসভার অধিবেশন ডাকা হত । এই সভা বা মহাসভা গ্রাম সম্প্রদায় ও ব্যক্তির জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারত । গ্রামবাসীদের প্রদেয় রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়, জলসেচ ও পথঘাট রক্ষার দায়িত্ব মহাসভার হাতে ছিল । রাজস্ব আদায় করে তা সরকারের কাছে জমা দেওয়ার দায়িত্বও এর হাতে ছিল । পতিত জমি উদ্ধার করে কৃষি এলাকা বাড়ানোর দায়িত্ব সভা পালন করত । মহাসভা জমি ও জলসেচ অধিকার সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করত ।

'নগরম' ছিল আধা গ্রাম, আধা শহরের বণিক সভা । কাজের দিক থেকে উর ও সভার মতই ছিল নগরমের দায়িত্ব । কেউ কেউ নগরমকে বণিকদের নিগম বা গিল্ড বলেছেন । এই নিগম গুলি উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য কিনে তা অন্যত্র বন্টন করত । লোকের টাকা-কড়ি জমা রাখা এবং আধুনিক ব্যাঙ্কের মত চড়া সুদে বণিকদের ঋণ দিত । রাজা ও কর্মচারীরা তাদের সঞ্চিত অর্থ এই নগরমে জমা রাখত । ডঃ নীলকান্ত শাস্ত্রী মনে করেন নগরম ছিল একটি অন্যতম স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যস্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ এলাকায় একমাত্র সভা বা সংগঠন ।

চোল শাসনে গ্রামীণ পর্যায়ে প্রজাসাধারণ যে স্বাধীনতা ভোগ করত সমকালীন ভারতে তা অভূতপূর্ব ছিল । কিন্তু নীলকান্ত শাস্ত্রী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা বলতে চেয়েছেন, চোল আমলে গ্রামগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও সর্বস্তরের মানুষের উন্নতি হয়নি । এই শাসনে উপকৃত হয়েছিল কেবল সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মানুষ, সাধারণ মানুষ অবহেলিত ছিল । তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে চোল আমলে সমাজে যথার্থ সাম্য প্রতিষ্ঠিত না থাকলেও ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেনি । বরং উভয় শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক আদান প্রদানের শুভ মানসিকতা সক্রিয় ছিল । ধনীরা দরিদ্রের জন্য অকাতরে দান-ধ্যান করতেন । জনগণের প্রদেয় রাজস্বের একাংশ সেবামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে ফিরে আসত ।

পরিশেষে তাই বলা যায়, চোল আমলে গ্রামীন স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক স্বায়ত্ত-শাসনের তুলনা করা যেতে পারে । চোলরা গ্রামগুলিকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিল এবং গ্রাম শাসনের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল, তা চোল শাসনব্যবস্থাকে এক বিশিষ্টতা দান করেছে । অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার চোলদের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'চোল কর্মচারীরা গ্রামের শাসনব্যবস্থায় শাসকের পরিবর্তে পরামর্শদাতার ভূমিকা নিত । এই কারণে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব গ্রামে বেশি পড়ত না এবং গ্রামগুলি অব্যাহত গতিতে উন্নতি লাভ করেছিল । উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় তামিলনাদে যে অনেক বেশি সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তার মূলেও হয়তো রয়েছে চোলদের গ্রাম শাসন পদ্ধতি'।

✍ সামুদ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল ঃ সামুদ্রিক কার্যকলাপে চোল রাজারা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন । রাজরাজের সময় থেকে প্রথম কুলোত্তুঙ্গের সময় পর্যন্ত চোল রাজারা দীর্ঘ ১৩৫বছর (৯৮৫-১১২০) ধরে নৌবহর সক্রিয় রেখেছিলেন এবং নৌঅভিযান পাঠিয়েছিলেন । ভারতের ইতিহাসে আর কোন শক্তির এতবড় নৌবহর ছিল না । ভারত মহাসাগরে মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়, সুমাত্রা, জাভা এবং ইন্দোচিনে তাদের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন । এমনকি চিনের সঙ্গেও চোলদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ।

রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল পিতা-পুত্র চোলদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন । তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় চোল ইতিহাস শতাব্দীকাল ব্যাপী ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল । চোল রাজ্য ছিল

একটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক রাজ্য, যাকে রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল ভারতের মূল ভূখন্ড ছাড়িয়ে তাদের নৌবহরের দাপটে বঙ্গোপসাগরকে এক বিরাট সামুদ্রিক সাম্রাজ্যে পরিণত করে । তাই বলা যায় তারা নৌবহরের সাহায্যে বঙ্গোপসাগরকে 'চোল হ্রদে' পরিণত করেছিলেন ।

চোলদের সামুদ্রিক অভিযানের সূচনা করেছিলেন প্রথম রাজরাজ । রাজরাজই প্রথম তামিল রাজা যিনি তাঁর প্রস্তর লেখগুলির ভূমিকায় তাঁর রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছিলেন । এই প্রস্তর লেখগুলি থেকে তাঁর সামুদ্রিক সাম্রাজ্য বিস্তারের চরম কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি ইংল্যান্ডের টিউডর রাজাদের নৌবহরের গুরুত্ব অনুভব করে একটি শক্তিশালী নৌবহর স্থাপন করেছিলেন । সমসাময়িক দক্ষিণ ভারত ও তাঁর তিন দিকের সামুদ্রিক পরিবেশ চোল সাম্রাজ্যের পক্ষে নিরাপদ ছিল না । ভারতের উপকুলীয় বাণিজ্য থেকে আরব বণিকদের স্বার্থ খর্ব করার জন্য রাজরাজ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন । অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার উল্লেক করেছেন, রাজরাজের পান্ড্য ও কেরল রাজ্য আক্রমণের পেছনে বৃহত্তর সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক স্বার্থ ছিল ।

তাঞ্জোর লিপিতে রাজরাজের মহিমা কীর্তিত হয়েছে । তিনি তাঁর নৌবহরের সাহায্যে সিংহল আক্রমণ করেন । এই ঘটনা চোলদের সামুদ্রিক সাম্রাজ্য স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল । রাজরাজ সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর ধ্বংস করে পোলন্নরুবতে সিংহলের নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন । চোলদের লেখতে রাজরাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের পরিচয় পাওয়া যায় । এটা ছিল হাজার-দ্বীপ সংলগ্ন মালদ্বীপ বিজয় ।

রাজরাজ যে সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের সূচনা করেছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করে তাঁর সুযোগ্য পুত্র রাজেন্দ্র চোল নৌ সাম্রাজ্যের সৌধ নির্মাণ করেন । রাজেন্দ্র চোলের পরাক্রান্ত নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রহ্মদেশের পেগুপ্রদেশ এবং সেখানকার কয়েকটি বন্দর অধিকার করে । অতপর শ্রীবিজয় ও যবদ্বীপের নরপতি শৈলেন্দ্র বংশীয় বিজয়তুঙ্গকে পরাজিত করেন । এরফলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের কিছু অংশ চোলদের অধিকারে আসে । এর আগে কোন ভারতীয় নরপতির পক্ষে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এইরকম গৌরবময় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি ।

চোল লেখে উল্লেখিত আছে যে রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয়ের রাজধানী অগ্নিদগ্ধ করেছিলেন এবং সিংহলের ন্যায় শ্রীবিজয়কে একটি চোল প্রদেশে পরিণত করেছিলেন । অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার মনে করেন, সাম্রাজ্য বিস্তার নয় ভারতের চিনাবাণিজ্যে শ্রীবিজয়ের মধ্যস্থের ভূমিকা খর্ব করার জন্য রাজেন্দ্র চোল ঐরাজ্যটি আক্রমণ করেছিলেন।'তিরুবালাঙ্গুরুপট্ট' থেকে জানা যায় রাজেন্দ্র চোল বীরদর্পে শ্রীবিজয় অভিযানে অগ্রসর হন এবং পান্ড্য ও কেরল রাজ্য দখল করেন । রাজেন্দ্র চোল তাঁর শাসনকালের শেষদিকে আরবসাগরের মালদ্বীপ অধিকার করেন।

পরিশেষে চোলরাজারা দীর্ঘ ১৩৫ বছর ধরে তাদের পরাক্রান্ত নৌবহরের সাহায্যে সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপরাষ্ট্রে অভিযান চালিয়ে ছিলেন । কিন্তু একমাত্র সিংহল ছাড়া কোন এলাকা তাঁরা স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যভূক্ত করেননি । তাই চোলদের সামুদ্রিক আভিযানগুলির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা সংশয়ের সৃষ্টি হয় । ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন, রাজনৈতিক গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে নতুন নতুন রাজ্য গ্রাস করে দিগ্বিজয়ী আখ্যা লাভের জন্যই এই সকল অভিযান কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল । তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে ভারত মহাসাগরে নৌ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা চোল সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তা দিয়েছিল । ভারতীয় উপকুলীয় ও মহাসাগরীয় বাণিজ্যে আরব বণিকদের প্রাধান্য প্রতিহত হয়েছিল ।

পল্লব শিল্পকলা ঃ পল্লব রাজারা রাজ্যবিস্তার করে যেমন তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচয় দেন, তেমনি শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা তাঁদের বিদগ্ধমনের পরিচয় রাখেন । পল্লব শিল্প এমন এক বিশেষ রীতি ও ভঙ্গীতে গঠিত হয়, যা ছিল পল্লব রাজাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মন্ডিত । স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই শিল্পের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল । সূক্ষ্ম শিল্পের কাজে ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পল্লবরা স্বকীয়তা দেখান । ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই শিল্প বিকশিত হত । পল্লব শিল্পগুলি দেবদেবীর মন্দির ও রথের আকারেই প্রকাশ পায় ।

এই মন্দিরগুলিতে আমরা দ্রাবিড় শিল্পরীতির সাক্ষাৎ পাই । দ্রাবিড় রীতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই মন্দিরগুলির উচ্চতা পিড়ামিডের মত এবং বহুতল বিশিষ্ট হত । প্রতিটি তলেই গর্ভগৃহ থাকলেও উপরের তলগুলি ক্ষুদ্র হতে থাকে এবং মন্দিরে শীর্ষদেশের আকৃতি হত গম্বুজের মত । একে বলা হত 'স্তুপ' বা 'স্তুপিকা'। নিম্নতলের চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের চারদিক দিয়ে থাকত একটি আচ্ছাদিত প্রদক্ষিণপথ । মন্দিরের দেওয়ালে থাকত 'কুলুঙ্গী', আলো প্রবেশের জন্য । পল্লব স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল গোটা এক পাহাড় কেটে রথ বা মন্দিরের আকৃতিতে রূপান্তরিত করা এবং সেই মন্দিরে গায়ে ভাস্কর্যের কাজ করা । অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারের মতে, পল্লবযুগের পাহাড়-কাটা মন্দির শিল্পের মধ্যে বৌদ্ধমন্দিরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই যুগের শিল্পভাবনায় স্বাতন্ত্র্য ও বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায় ।

প্রথমপর্বের পল্লব স্থাপত্যগুলি পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল । এই মন্দিরগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ক) প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের আমলে নির্মিত সাধারণ স্তম্ভযুক্ত মন্দির এবং খ) নরসিংহবর্মন মহামল্ল ও তাঁর পরবর্তী শাসকদের আমলে নির্মিত মন্ডপগুলি।

মহেন্দ্রবর্মনের প্রথম পর্বের নির্মিত মন্দিরগুলি সাধাসিধে হলেও পরবর্তীকালে নির্মিত 'অনন্তশায়ন মন্দি' বা 'ভৈরবকোন্ডের মন্দির'-এর গঠন রীতি জটিল হয়েছে । এই মন্দিরগুলির গঠন শৈলীর ক্রমবিবর্তন পরবর্তী স্তরের মন্দিরে আরও সুস্পষ্ঠ রূপ লাভ করেছে । মহামল্ল গোষ্ঠীর আমলে নির্মিত হয় মহাবলীপুরমের দশটি মন্ডপ ও 'সপ্তরথ'। সপ্তরথের মধ্যে 'দ্রৌপদী রথ' চতুষ্কোণ হলেও অন্য রথগুলি পিড়ামিডের আকৃতির এবং তাদের প্রতিটি তল কার্নিসযুক্ত ও চৈত্যের মত খিলান দ্বারা শোভিত ।

এর পরবর্তী স্তরে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে রচিত মন্দির স্থাপত্যের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলিকেও দুইভাগে ভাগ করা যায় । প্রথম ভাগে ছিল রাজসিংহ গোষ্ঠীর আমলে নির্মিত মামল্লপুরমের তীর মন্দির, কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির ও বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির । এদের মধ্যে বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরটি পল্লব স্থাপত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির । দ্বিতীয় ভাগে ছিল নন্দীবর্মন গোষ্ঠির আমলে নির্মিত মুক্তেশ্বর ও মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরদ্বয় । তবে এই পর্বের মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট এবং এগুলিতে অবক্ষয়ের ছাপ ছিল স্পষ্ঠ ।

ভাস্কর্যশিল্পে পল্লব যুগকে দক্ষিণ ভারতীয় ঐতিহ্যের সূচনাকারী বলে অভিহিত করা যায় । অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর মতে, পল্লব ভাস্কর্যে বেঙ্গীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । পল্লব ভাস্কর্যের যুগান্তকারী নিদর্শন হল মহাবলীপুরমের 'কীরাতার্জুনীয় রিলিফ'-টি । সমুদ্রমুখী পাহাড়ের প্রায় সমগ্র অংশ জুড়ে এটি নির্মিত হয়েছিল । দেবতা, মানুষ, জীবজন্তু, প্রকৃতি ইত্যাদি সবকিছুই এখানে স্থান পেয়েছে । সমালোচকদের মতে, পশুর প্রতি এত মমত্ববোধ পল্লব ভাস্কর্য ছাড়া আর কোন প্রাচিন ভাস্কর্যে দেখা যায় না । এছাড়া কৃষ্ণমন্ডপে 'পশুপালকের জীবন' ও মহিষমর্দিণী মন্ডপে 'যুদ্ধ ও শান্তি' ভিত্তিক ভাস্কর্য কর্ম পল্লব যুগের অপর দুটি নিদর্শন । পল্লব ভাস্কর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এদের স্বাভাবিকত্ব । মানুষ, দেবতা বা জীবজন্তু কোন ক্ষেত্রেই কোন একম গোপনীয়তা দ্বারা মূর্তিকে ভারাক্রান্ত করা হয়নি ।

চালুক্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ঃ চালুক্যশিল্প বলতে মোটামুটিভাবে বাদামির চালুক্য রাজাদের উৎসাহে নির্মিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শনই বোঝায় । প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা নাগর ও দ্রাবিড় শৈলীর মিশ্রণে চালুক্য শিল্প গড়ে উঠেছিল । চালুক্য অঞ্চলে যেসব স্থাপত্য নিদর্শন দেখা যায় তা সাধারণভাবে 'চালুক্য শৈলী' নামে পরিচিত । নাগর স্থাপত্য শৈলী ও দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলী-- দুটি স্থাপত্য শৈলী অবিকৃত অথবা কতকাংশে পরিবর্তিত রূপে 'চালুক্য রীতি' নামে প্রচলিত । দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরা নির্মাণ কার্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন । ফলে তাঁদের সময়কালে অত্যুৎকৃষ্ট স্থাপত্য নিদর্শনগুলি গড়ে উঠেছিল ।

বৃহৎ প্রস্তর খোদাই করে বহু মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল চালুক্য আমলে । অবশ্য পাথর খোদাই করে মন্দির নির্মাণ রীতিটি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বৌদ্ধরা । আইহোল ও বাদামির মন্দিরগুলি প্রস্তর খোদাই পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল । আইহোলে ছিল ৭০টি মন্দির এবং বাদামিতে ১০টি মন্দির । আইহোলকে বলা হয় 'ভারতীয় স্থাপত্যের লালন ক্ষেত্র'। আইহোলের মন্দিরগুলি তাদের পুরোন কাঠামো ও সুদৃঢ় পৌরুষোচিত শৌর্যের জন্য খ্যাত । আইহোলে তিনটি মন্দির বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে, এগুলি হল লাদখানের মন্দির, দুর্গা মন্দির ও হুচ্চিমল্লিগুড়ি মন্দির । আইহোলের আদিপর্বের মন্দিরের মধ্যে পাহাড় কেটে তৈরি লাদখানের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত । দুর্গা মন্দিরের বৈশিষ্ট্যে নতুন সংযোজন ছিল অন্তরাল ও মন্ডপের মধ্যবর্তী গৃহ । আর হুচ্চিমল্লিগুড়ি মন্দিরটি নাগররীতিতে তৈরি দুর্গা মন্দিরের অনুরূপ ।

চালুক্য শিল্পের অন্যতম কৃতিত্ব ছিল পাহাড় কেটে গুহা মন্দির নির্মাণ । চালুক্য রাজা মঙ্গলেশের রাজত্বকালে এই রকম গুহা মন্দির বাদামিতে নির্মিত হয়েছিল । চালুক্য রাজ্যের মধ্যে অজন্তা ও ইলোরার গুহা ছিল, এই গুহায় চালুক্য রাজারা কয়েকটি চৈত্যগৃহ পাহাড় খোদাই করে নির্মাণ করেছিলেন । অপরাপর শিল্প নিদর্শনের মধ্যে মেগুটির শিবমন্দির বিখ্যাত । এই মন্দিরে কবি রবিকীর্তি বিরচিত দ্বিতীয় পুলোকেশীর প্রশস্তি খোদাই করা আছে । আইহোলের বিষ্ণু মন্দিরটি বৌদ্ধবিহারের অনকরণে তৈরি করা হয় । চালুক্য আমলের মন্দির স্থাপত্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল মলপ্রভা নদীর বামতীরে ও বাদামির কাছে পত্তদকল । এখানে নির্মিত ১০টি মন্দিরের মধ্যে ৫টি নাগর রীতি এবং ৫টি দ্রাবিড় রীতিতে তৈরি । এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল 'পাপনাথ মন্দির'।

দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় রীতিতে নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের মহিষী লোকমহাদেবী নির্মিত 'বিরুপাক্ষ মন্দির'। এই মন্দিরের সঙ্গে কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরের পরিকল্পনা ও নকসার মিল আছে । তাই অনুমান করা হয় যে বিরুপাক্ষ মন্দিরের অতি উন্নত মানের পরিকল্পনা ও গঠন রীতিতে কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরের স্থপতিদের প্রেরণা ও প্রভাব কাজ করেছিল । বিশালাকার এই বিরুপাক্ষ মন্দিরটি লম্বায় ১২০ফুট। চালুক্য স্থাপত্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন এই মন্দির সম্পর্কে ঐতিহাসিক হ্যাভেল মন্তব্য করেছেন, 'এই মন্দিরটিতে ইউরোপের ধ্রুপদী গঠন রীতির সঙ্গে গথিক শিল্পের ভঙ্গিমার মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় ।'

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতকের মধ্যে চালুক্য ভাস্কর্য বিকশিত হয়েছিল । ভাস্কর্যের প্রধান কেন্দ্রগুলি ছিল আইহোল, বাদামি ও পত্তদকল । চালুক্য ভাস্কর্যের সঙ্গে পল্লব ভাস্কর্যের কিছু সাদৃশ্য দেখা যায় । চালুক্য ভাস্কর্য প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কোন্টিগুড়ির মন্দিরগুলির ভাস্কর্য । কোন্টিগুড়ির মন্দিরগুলিতে বারান্দার ন্যায় মন্ডপে সিংলিংএর পাথরের বড় বড় তিনটি ফলকে ব্রহ্মা, উমা-মহেশ্বর ও বিষ্ণুর ভাস্কর্য

লক্ষ্য করা যায় । বাদামির গুহা মন্দিরে চালুক্য আমলের ভাস্কর্যে অনেক নিদর্শন আছে । পাপনাথ মন্দিরের দেওয়ালগুলিতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কিছু কাহিনী উৎকীর্ণ করা হয়েছে । বিরুপাক্ষ মন্দিরেও উচ্চমানের ভাস্কর্য লক্ষ্য করা যায় ।

চালুক্য শাসন আমলে চিত্রশিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল । অজন্তা ও বাদামির গুহায় চালুক্য চিত্রশিল্পের কিছু নিদর্শন আছে । অজন্তার চমৎকার চিত্রগুলি কতকাংশে চালুক্য রাজাদের আমলে অঙ্কিত হয় । বাদামির ৩নং গুহাচিত্রে সর্বাপেক্ষা প্রথম ব্রাহ্মণ্য চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায় । এখানে ব্যদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্যের রাজকীয় এক দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে । এতে কোন এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব ও তাঁর সহকারিদের উপস্থাপিত করা হয়েছে । এছাড়া রাজপরিবারের লোকজন এই দৃশ্য দেখছেন, এমন চিত্রও আঁকা হয়েছে । অজন্তার গুহার দেওয়ালের একটি চিত্রে দ্বিতীয় পুলোকেশীর প্রেরিত এক দূতকে পারসিক সম্রাট দ্বিতীয় খসরু রাজসভায় গ্রহণ করছেন দেখা যায় ।

✍ পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের কৃতিত্ব ঃ পল্লব রাজবংশের ইতিহাসে প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ৬০০খ্রিঃ সিংহবিষ্ণুর পর প্রথম মহেন্দ্রবর্মন পল্লব সিংহাসনে বসেন । মহেন্দ্রবর্মনের রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । নেল্লোর ও গুন্টুর এলাকা এই রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিল । গুন্টুরের কোপিতাশ্বর মন্দিরের লিপি থেকে তাঁর রাজ্য সীমার কথা জানা যায় । মহেন্দ্রবর্মনের সমসাময়িক ছিলেন উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধন এবং দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলোকেশী । হর্ষবর্ধনের সঙ্গে মহেন্দ্রবর্মনের কোন রাজনৈতিক মৈত্রী বা সংঘাতের কথা জানা যায়নি । হয়তো দূরত্বের কারণে উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ছিলনা । তবে মহেন্দ্রবর্মনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলোকেশী ।

মহেন্দ্রবর্মনের আমলেই চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে, যা প্রায় এক শতক দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে । মহেন্দ্রবর্মন বেঙ্গীর পূর্ব চালুক্যদের পল্লব আধিপত্যে আনার চেষ্টা করলে দ্বিতীয় পুলোকেশী তাতে বাধা দেন । পল্লবরা চালুক্যদের পূর্বতন অধিরাজ অধুনা শত্রু কদম্ব বংশের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলে চালুক্য-পল্লব দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয় । এর সঙ্গে ভৌগোলিক কারণ যুক্ত হয়ে এই দ্বন্দ্বকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল । এই অঞ্চলের নদীগুলির মধ্যে গোদাবরী ও কৃষ্ণা বেঙ্গীর বদ্বীপের দুদিক দিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয় । বাতাপির চালুক্য শক্তি এই জলপথ ও নদীগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইত । এই উদ্দেশ্যেই তারা বেঙ্গীতে পূর্ব চালুক্য বংশের শাসন স্থাপন করে।

পল্লব শক্তি তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণের উপকুল অঞ্চল থেকে এসে এই নদী মোহনা অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করলে পল্লব-চালুক্য বিবাদ তীব্রতর হয় । বস্তুত এই অঞ্চলের অধিকার নিয়ে এই দুই অঞ্চলের বিভিন্ন রাজবংশের বহু বছর ধরে সংঘাত চলে । চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলোকেশী পল্লব রাজধানী কাঞ্চী আক্রমণ করলে পালাল্লুরের যুদ্ধে মহেন্দ্রবর্মন তাঁকে বাধা দেন এবং রাজধানী কাঞ্চী রক্ষা করতে সক্ষম হন । আইহোল প্রশস্তিতে এই যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলোকেশীর জয়ের কথা বলা হয় । অথচ কাসাকুদ্দি লিপিতে পল্লব পক্ষ থেকে জয়লাভের দাবী করা হয় । ডঃ মহালিঙ্গম মনে করেন যে, পালাল্লুরের যুদ্ধে পুলোকেশীর হাতে মহেন্দ্রবর্মন পরাস্ত হননি, হয়তো পরবর্তী পল্লব রাজা নরসিংহবর্মন পরাস্ত হয়েছিলেন ।

মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন বহুবিধ গুণের অধিকারী, এজন্য লোকে ‘বিচিত্রচিত্ত’ বলে অভিহিত করত । দক্ষিণ ভারতের শিল্প ইতিহাসে তাঁর একটা বিশেষ স্থান আছে । তিনি স্থাপত্য কার্যে চিরাচরিত ইট-কাঠের পরিবর্তে পাহাড়কে অবলম্বন করেছিলেন । ত্রিচিনাপল্লি, চিঙ্গেলপেট ও আর্কট জেলার পাহাড় খোদাই করে বহু মন্দির তৈরি করেন । তাঁর রচিত ‘মত্ত বিলাস প্রহসন’ সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতার পরিচয় দেয় । সমকালীন কাপালিক, পাশুপত প্রভৃতি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের কথা এই নাটক থেকে জানা যায় । মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর তিনি গ্রন্থ রচনা করেন । পদুকোট্টাই রাজ্যের সঙ্গীত সম্পর্কীয় শিলালিপি তাঁর নির্দেশে খোদাই করা হয় ।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের শাসনকাল কেবল পল্লব ইতিহাস নয়, সমগ্র দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছিল । মহেন্দ্রবর্মনের শাসনকাল থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতকে পল্লব শক্তির পতন পর্যন্ত সময়কাল অতি ‘সৃজনশীল যুগ’ বলে ধরা হয় । শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে দিয়ে এবং নায়নার ও আলবারগণের প্রচারের ফলে এই যুগে তামিল অঞ্চলে হিন্দুধর্মে নবজাগরণ ঘটেছিল । দক্ষিণ ভারতীয় সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলায় তখন নবযুগের সূচনা হয়েছিল । রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দীর্ঘস্থায়ী পল্লব-চালুক্য দ্বন্দ্ব প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের আমলেই শুরু হয়েছিল । দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এই যুগে অব্যাহত ছিল ।

✍ পল্লব শাসনব্যবস্থা ঃ পল্লব রাজ্যের উত্থাণ ও পতন ভারতের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায় । উত্তর ভারতে যখন গুপ্তদের উত্থাণ ঘটেছিল, তখন দক্ষিণ ভারতে উত্থাণ ঘটেছিল পল্লবদের । কিন্তু অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও গুপ্তদের তুলনায় পল্লবদের শাসন অনেক দিন স্থায়ী হয়েছিল । ঘন ঘন চালুক্য আক্রমণ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও পল্লব রাজারা দক্ষিণ ভারতে এক সুগঠিত ও উন্নত শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন । পল্লব শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ‘বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির লিপি’ এবং নন্দীবর্মনের ‘উদয়েনদিরাম তাম্রশাসন’ আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করে । এছাড়াও মহেন্দ্রবর্মনের সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘মত্তবিলাস প্রহসন’ থেকেও পল্লব শাসনের কিছু তথ্য পাওয়া যায় ।

প্রাচিন ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে পল্লব শাসনব্যবস্থায় রাজা ছিলেন শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ । রাজার ক্ষমতা ছিল অবাধ । পল্লব রাজাদের লিপি থেকে জানা যায় তাঁরা 'মহারাজাধিরাজ', 'ধর্মমহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করতেন । পল্লব শাসকেরা বিশ্বাস করতেন যে রাজশক্তির উৎস দৈব শক্তি এবং তাঁরা বংশ পরম্পরায় তা ভোগ করার অধিকারী । কোন কোন পল্লব রাজার ধারণা ছিল ভগবান ব্রহ্মা থেকে তাঁদের উৎপত্তি । রাজা ভগবান ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক, প্রধান সেনাপতি, প্রধান বিচারক ও প্রদান আইন প্রণেতা । রাজপদ ছিল বংশানুক্রমিক, উত্তারাধিকারী মনোনয়ন বা নির্বাচনের কোন প্রমাণ নেই । পল্লব রাজারা মন্ত্রিসভা ও আমলাতন্ত্রের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন ।

পল্লব শাসনে বহু সংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হত । সামরিক এবং অসামরিক উভয় বিভাগেই উচ্চ থেকে ক্রমপর্যায়ে নিচ পর্যন্ত বহু রাজকর্মচারী ছিল । পল্লব লিপি থেকে জানা যায় যে রাজ-আদেশ রাজার ব্যক্তিগত সচিব লিখে নিতেন এবং যে যে বিভাগে পাঠানো প্রয়োজন তা করতেন । রাজকুমারগণ উচ্চপদে নিযুক্ত হতেন । জেলার উপরে ছিলেন 'রট্টিক' বা জেলাশাসক । পল্লব লিপিতে 'মনিক্ক-পন্ডারম'-এর উল্লেখ আছে । রাজকোষের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীগণ ছিলেন 'কোষাধ্যক্ষ', 'কাপ্পার', 'কোডুক্কপিল্লাই'। এছাড়াও শুল্ক আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, অধ্যক্ষ, বনরক্ষক, 'গ্রামভোজক', 'দূতিক' প্রমুখ কর্মচারীও ছিলেন । কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রিদের মধ্যে প্রধান ও পুরোহিত একই ব্যক্তি হতেন ।

সমসাময়িক লিপিতে বিচার বিভাগের বিশেষ উল্লেখ নেই । পল্লব লিপি থেকে জানা যায় 'ধর্মাসন' ছিল তখনকার বিচার বিভাগীয় আদালত । প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের 'মত্তবিলাস প্রহসন' থেকে পল্লবদের বিচারবিভাগীয় শাসনব্যবস্থার অনেক তথ্য পাওয়া যায় । ঐ গ্রনথ থেকে 'অধিকরণ' অর্থাৎ আইন বিভাগীয় আদালত, বিচারক, বিচার বিভাগীয় কর্মচারী প্রভৃতির কথা জানা যায় । রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক, গ্রামের বিচার সংক্রান্ত বিষয় ছিল গ্রামের 'সভার'-র হাতে । ছোটখাটো অপরাধের বিচার গ্রামেই হত এবং তার উপরে জেলায় বিচারের দায়িত্ব ছিল রাজকর্মচারিদের উপর ।

শাসনের সুবিধার জন্য পল্লব রাজ্যকে কতকগুলি 'মন্ডল' বা প্রদেশে, প্রদেশগুলি 'কোট্টম', কোট্টমগুলি 'নাড়ু'-তে এবং নাড়ুগুলি 'উর' বা গ্রামে বিভক্ত ছিল । গ্রাম ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রশাসনিক বিভাগ, যার দায়িত্বে ছিলেন 'গ্রামভোজক' বা গ্রামাধক্ষ্য । গ্রাম শাসনে বেসরকারি গ্রাম-সভার গুরুত্ব ছিল । পল্লব লিপিতে গ্রাম-সভার সদস্যদের 'মহত্তর' বলা হয়েছে । গ্রাম দুধরণের ছিল, এক ধরণের গ্রামে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ বাস করত, যারা রাজাকে ভূমিরাজস্ব দিত । আর একধরণের গ্রাম ছিল 'ব্রহ্মদেয় গ্রাম', যেখানে কেবল ব্রাহ্মণ বাস করত এবং রাজাকে ব্রাহ্মণের পক্ষ থেকে কোন কর দিতে হত না । ব্রাহ্মণরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ায় সমস্ত প্রকার কর প্রদান থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল ।

ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে জমি জরিপ করে জমির সীমানা নির্ধারণ করে চাষযোগ্য ও পতিত জমির হিসাব রাখা হত । ভূমিরাজস্ব ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস । তাম্রশাসনের বর্ণনা অনুসারে মনে হয় গ্রামের মানুষ উৎপন্ন ফসলের ১/৬ থেকে ১/১০ অংশ কর হিসাবে রাজাকে প্রদান করত । ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব প্রদানের পরিবর্তে কর্মচারীদের মাধ্যমে সমস্ত গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ করে রাজার নিকট প্রেরণ করা হত । পল্লব যুগে মোট ১৮ প্রকার কর গ্রামবাসীদের দিতে হত । লবন ও চিনি প্রস্তুত, শস্য বিক্রয়ের কর আদায় করা হত । গ্রামীণ কারিগরদের নিকট থেকেও শুল্ক আদায় করা হত । মামল্লপুরমে একটি উল্লেখযোগ্য নগর ও সমুদ্র বন্দর ছিল । এই বন্দর থেকে মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত ।

--- সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ---

১) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা-- মাইতি ও মন্ডল
২) ভারতের ইতিবৃত্ত (২য় খন্ড)-- গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী
৩) ভারতের ইতিহাসের উৎস সন্ধানে-- দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৪) প্রাচিন ভারতের ইতিহাস-- সুনীল চট্টোপাধ্যায়
৫) ভারতের ইতিহাস-- অতুলচন্দ্র রায় ও সুরঞ্জনা স্যানাল
৬) ভারতের ইতিহাস-- জীবন মুখোপাধ্যায়

---------- প্রশ্নাবলী ----------

রচনাধর্মী প্রশ্ন (মান - ১০)

১) শশাঙ্কের নেতৃত্বে একটি আঞ্চলিক শক্তিরূপে গৌড়ের উত্থানের বর্ণনা কর ।
২) গৌড়রাজ শশাঙ্কের কৃতিত্ব আলোচনা কর ।
৩) তুমি কি মনে কর ধর্মপাল ছিলেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ?
৪) উত্তর ভারতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে ত্রিশক্তি সংঘর্ষের কারণ কি ছিল ?
৫) কৈবর্ত বিদ্রোহের প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ কর ।
৬) চোলদের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার পরিচয় দাও ।
৭) রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল কীভাবে একটি সামুদ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ?
৮) পল্লব শিল্পকলা সম্পর্কে কি জান ?
৯) চালুক্য স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও চিত্রকলার পরিচয় দাও ।
১০) পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর ।
১১) পল্লব শাসনব্যবস্থার পরিচয় দাও ।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাধর্মী প্রশ্ন (মান-৫)

১) ‘মাৎস্যন্যায়’ বলতে কি বোঝ ?
২) পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গোপালের ভূমিকা নির্ণয় কর ।
৩) রাজপুত জাতির উৎপত্তির ইতিহাস নির্ণয় কর ।
৪) রাষ্ট্রকূট শাসনব্যবস্থার পরিচয় দাও ।
৫) সেন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজয় সেনের ভূমিকা নিরূপণ কর ।
৬) ইখতিয়ার উদ্দিন বক্তিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলা দখলের বিবরণ দাও ।
৭) রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের কৃতিত্বের পরিচয় দাও ।
৮) প্রতিহাররাজ মিহিরভোজের কৃতিত্বের পরিচয় দাও ।
৯) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলোকেশীর কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (মান-২)

১) ‘অগ্নিকুল তত্ত্ব’ বলতে কি বোঝ ?
২) রাষ্ট্রকূট যুগে প্রচলিত করগুলি কি ছিল ?
৩) রাষ্ট্রকূট শাসনব্যবস্থায় গ্রামীণ প্রশাসন কেমন ছিল ?
৪) পাল বংশের ইতিহাস জানার উপাদান কী ?
৫) ‘প্রকৃতিপুঞ্জ’ বলতে কি বোঝ ?
৬) বক্তিয়ার খলজির বাংলা বা নদীয়া জয়ের উপাদান কি কি ?
৭) তুমি কি মনে কর বক্তিয়ার খলজি চাতুরীর দ্বারা নদীয়া জয় করেছিলেন ?
৮) সেন বংশের প্রতিষ্ঠা কে কিভাবে করেন ?
৯) ‘মাৎস্যন্যায়’ বলতে কি বোঝ ?
১০) ‘ত্রিশক্তি সংঘর্ষ’ কী ?
১১) ‘ত্রিশক্তি সংঘর্ষ’-এর গুরুত্ব কি ছিল ?
১২) কৈবর্ত বিদ্রোহ বলতে কি বোঝ ?
১৩) ‘উর’ ও ‘সভা’ কী ?
১৪) ‘নগরম’ কী ?
১৫) ‘চোল হ্রদ’ কী ?
১৬) পল্লব স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী ?
১৭) মহেন্দ্রবর্মনের আমলে নির্মিত পল্লব স্থাপত্যগুলি কি কি ?
১৮) মহামল্ল গোষ্ঠীর আমলে নির্মিত পল্লব স্থাপত্যগুলি কি কি ?
১৯) ‘কীরাতার্জুনীয় রিলিফ’ কী ?
২০) ‘চালুক্য শৈলী’ বলতে কি বোঝ ?
২১) ‘বিরুপাক্ষ মন্দির’-এর বিশেষত্ব কী ছিল ?
২২) ‘আইহোল’ কেন বিখ্যাত ?
২৩) পল্লব প্রশাসনে যুক্ত কর্মচারিদের উল্লেখ কর ।

---- সমাপ্ত ----